মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্যে সংকট

হারুন-আর-রশিদ

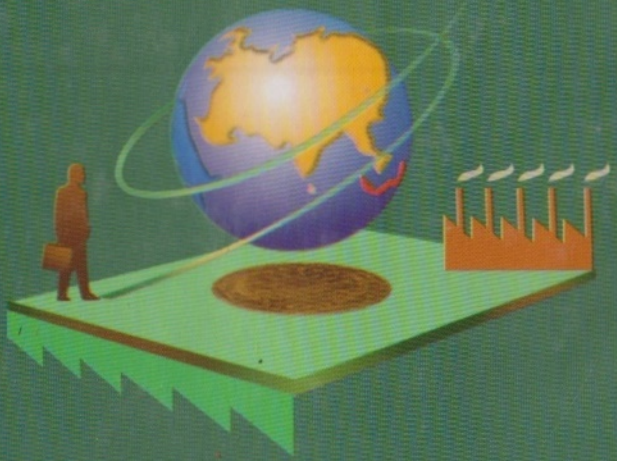

উৎসর্গ ঃ

শ্রদ্ধেয় আম্মাজান সৈয়দেন্নেসা বেগমকে,

যার দোয়া, স্নেহ-মমতায় ও শাসনে লালিত-পালিত হয়ে আজকের অবস্থানে এসে পৌঁছেছি, দুঃখজনক যে আজ তিনি ব্রেইন স্ট্রোকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে দীর্ঘদিন যাবত বাকশক্তিহীন অবস্থায় শয্যাশায়ী। আম্মাজানের এই কষ্ট প্রতিনিয়ত আমাকে ব্যথিত করে। আমি তাঁর রোগমুক্তির জন্য সবার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

৮০ দশকের শেষ দিকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনুকূলে বিভিন্ন মতামত ও আলোচনা কাগজে প্রকাশ হতে থাকে। স্বনামধন্য জ্ঞান তাপস অর্থনীতিবিদরাও বিষয়টিকে কিভাবে বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য করা যায় তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এ নিয়ে তারা গবেষণামূলক কিছু নিবন্ধও লিখেন।

মূলত এ দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত হয় নব্বইয়ের প্রথম দিকে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো মুক্ত বাজার অর্থনীতির ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেন এবং ১৯৯৬ সালে তাদের রাজনৈতিক ইসতেহারে বিষয়টিকে সংযুক্ত করেন। যা হোক বিগত দশ বছরে (১৯৯০ থেকে ২০০০) খোলা বাজার অর্থনীতিতে আমরা কতটুকু সফল বা নিষ্ফল, এ সময়ে আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপ্তি লাভ করেছে নাকি আরও সংকুচিত হয়েছে সে আলোকে নাতিদীর্ঘ কিছু নিবন্ধ নিয়ে বইটি সাজিয়েছি। নিবন্ধগুলি শীর্ষস্থানীয় সকল জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি আসলে জিনিসটা কি, এর রূপরেখা স্বদেশী আলোকে কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে গ্রন্থটিতে। দেশীয় সংস্কৃতি ও শিল্প পণ্য খোলা বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় সম্মুখ পানে বুক উঁচু করে এগিয়ে যেতে পারছে কিনা, সেই চিন্তা খোদ আমেরিকা ও ইউরোপের ধনী বণিকরাও করেছে, আমাদের সেরকম জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ ব্যবস্থা নীতিগতভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। সে ধরনেরই একটি জোরালো কমিটমেন্টের কথাও গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে।

সৃজনশীল উদ্যোমী প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তানের স্বত্বাধিকারী আবদুল কাদির খান ভাইও এ ধরনের একটি গ্রন্থ লেখার জন্য বহুদিন ধরে আমাকে তাগিদ দিয়ে আসছিল। মূলত তার অনুপ্রেরণায়ই গ্রন্থটি আমি লিখতে শুরু করি। গ্রন্থ রচনার প্রস্তুতিকল্পে আমাকে জাতীয় দৈনিক ও বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের প্রকাশিত নিবন্ধ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকাশিত অর্থনৈতিক সমীক্ষাগুলো নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। সে সমস্ত নিবন্ধের অনেক উদ্বৃতি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ড্যানিয়েল ফাসফেণ্ডের অর্থনীতিবিদদের যুগ, গ্রন্থটির অনুবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর আবদুল্লাহ ফারুক এবং দেশের বিশিষ্ট কয়েকজন লেখকের গ্রন্থও আমাকে পড়তে হয়েছে।

অগণিত পাঠক ও সুধী সমাজে বইটি সুখপাঠ্য হলেই ভাববো গ্রন্থ রচনায় আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। ঐসব পাঠকের কাছে আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকবো যারা আমার বইটি কিনবেন এবং বিভিন্ন মতামত দিয়ে সাহায্য করবেন যাতে অর্থনীতির একজন সামান্য লেখক হিসেবে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি।

দুঃখজনক সংবাদ, যার অনুপ্রেরণায় আমি এই গ্রন্থ রচনায় হাত দেই– বইটি প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই (১লা নভেম্বর ২০০০) আমার প্রাণপ্রিয় প্রকাশক খান ভাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেন। আমি তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

তারিখ ৩১ জানুয়ারি ২০০১ ইং
ঢাকা

হারুন-আর-রশিদ

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থঃ

১. বিবেকের বক্তব্য
২. বর্তমান সংকট ঃ রাজনীতিবিদরাই দায়ী
৩. বাংলাদেশ ঃ অস্তিত্বের লড়াই
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট
৫. শেকড় সন্ধানে বাংলাদেশ
৬. স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট এবং কিছু তথ্য
৭. এক মোহনায় (গল্প গ্রন্থ)
৮. অন্যরকম (উপন্যাস)
৯. আবার যুদ্ধ (উপন্যাস)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। মুক্ত বাজার অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশের অবস্থান ৯
২। মুক্ত বাজার অর্থনীতির রূপরেখা প্রসঙ্গে ১২
৩। বাজার অর্থনীতি ঃ নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ ১৫
৪। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি নাকি উন্মুক্ত বর্ডার অর্থনীতি ১৮
৫। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সংকট ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ..... ২২
৬। বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী মুক্ত বাজার অর্থনীতির হুকুমদাতা..... ২৬
৭। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবাদে লবণ শিল্পে ধ্বস নেমেছে..... ২৯
৮। বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন ৩১
৯। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব ঃ বাংলাদেশের মুদ্রণ শিল্প এখন ভারতের দখলে ৩৪
১০। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় মুক্ত বাজার অর্থনীতির অন্তরায় ৩৮
১১। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় ঃ দেশের অর্থনীতির বারটা বাজাচ্ছে ৪২
১২। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধক ৪৯
১৩। খেলাপি ঋণে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি ৫২
১৪। টি. এন. টি. বোর্ডের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন ৫৫
১৫। রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা ২০০৫ সালে জাতিকে আরও ঋণের ফাঁদে জড়াবে..... ৫৮
১৬। বস্ত্র ও পোশাক শিল্প ধ্বংসের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র ৬৩
১৭। বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাত সংস্কার প্রয়োজন ৬৮
১৮। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওরা আসলে কি করছে..... ৭৩
১৯। জ্বালানী তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়ন বোঝার উপর শাকের আঁটি ৮২
২০। বাংলাদেশী চা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে বসেছে ঃ সরকার উদাস ৯০
২১। বাজেটে ব্যক্তি কর নির্ধারণে কিছু প্রস্তাব। ৯৩
২২। সাপ্টা এবং এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি আর ট্রানজিট চুক্তি এক নয় ৯৭
২৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ বিধি কেমন হওয়া উচিত ১০৪
২৪। বিপর্যস্ত অর্থনীতিঃ জাতির জন্য মহা বিপদ সংকেত ১২৭
২৫। চামড়া শিল্প সামনে ঘোরতর দুর্দিন ১৩২
২৬। ওষুধের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্নঃ চোরাই পথে অবাধে ভারতীয় ওষুধ ঢুকছে ১৩৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুক্ত বাজার অর্থনীতি ঃ বাংলাদেশের অবস্থান

গোটা দুনিয়ায় এখন মুক্ত বাজার অর্থনীতির জোয়ার বইছে। সেই জোয়ারের উত্তাল ঢেউ বাংলাদেশেও আঘাত হেনেছে বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে।

এখন মুক্ত আকাশ, মুক্ত অর্থনীতি, মুক্ত সংস্কৃতি, ভিসা মুক্ত বিশ্ব, শ্রমের অবাধ বিচরণ, এ সমস্ত কথা বেশি শোনা যাচ্ছে। সেটেলাইট ও ইন্টারনেট মিডিয়া তথা তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের বদৌলতে মানুষ শিল্পপণ্যের গুণাগুণ ঘরে বসেই জানতে পারছে এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন শিল্পকে যে যত বেশি জাকঁজমকপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে সেই দেশের শিল্প পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়েছে বেশি। মুক্ত বাজার অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট মিডিয়ার অবদান সবচেয়ে বেশি। সেই সূত্রে তথ্য প্রযুক্তিও বড় শিল্প হিসেবে বর্তমান বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সরল অর্থে আবিধানিকভাবে মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলতে আমরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্যের অবাধ বিচরণ বা আদান-প্রদানকে বুঝি। পণ্যের মূল্য সীমিত, গুণাগুণ ভাল এবং বাজারজাতকরণের আধুনিক টেকনোলজি যে যত বেশি রপ্ত করতে পেরেছে সেই দেশের পণ্য অন্য দেশের বাজার খুব সহজে দখল করতে পেরেছে। মনে হয় এ ব্যাপারে আমরা উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে বহু পিছিয়ে আছি। উন্নয়নশীল দেশসমূহ তাদের শিল্প পণ্য নিজেদের চাহিদা পূরণ করে আজ বিদেশে রপ্তানি করছে। কিন্তু আমরা পারছিনা নানাবিধ সমস্যার কারণে। স্বাধীনতার উষালগ্নে রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকরাই ব্যক্তিস্বার্থে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ করে লুটের আখরায় পরিণত করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের কাছে তখন জিম্মি হয়ে পড়েছিল প্রতিষ্ঠানের কর্তা-ব্যক্তিরা। ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ও প্রতিষ্ঠানের অসৎ কর্মকর্তাগণ মিলে লুটপাটের মাধ্যমে শিল্প ইউনিটগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। জাতীয়করণ করার ফলে এ ধরনের ঘটনা স্বাধীনতার উষালগ্নে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে একেবারেই রুগ্ন করে ফেলেছিল। আর এরই সুযোগে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের পণ্য বাংলাদেশের বাজার খুব সহজেই দখল করে ফেলেছে। আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা উদার বাণিজ্য নীতির নামে এমন কিছু পদক্ষেপ আমরা স্বাধীনতার পর গ্রহণ করেছি যা দেশকে পঙ্গুত্বের দিকে নিয়ে গেছে। খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল ও আদমজি জুটমিল ছিল এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার পর এই দুটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান লাভের মুখ দেখেনি। দুঃখজনক যে বিদেশ থেকে অবাধভাবে যাতে পণ্য আসতে পারে সেই লক্ষ্যে, বিশেষ করে আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা সহজ পদ্ধতি

www.pathagar.com

অর্থাৎ আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট কমিয়ে দিয়েছি কিন্তু রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশী পণ্যের রপ্তানির জন্য শুল্ক মুক্ত সুবিধা দেয়া হয়নি। বাণিজ্য নীতিতে আরও কিছু জটিলতা লক্ষণীয়। যে সমস্ত পণ্য এখানে উৎপন্ন হয়, তা যাতে অধিক পরিমাণে উৎপাদন হতে পারে সে জন্য ঐ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ট্যাক্স হলিডের আওতায় এনে উৎপাদন খরচ যাতে কম পড়ে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তাহলে লাভ করেও সীমিত মূল্যে পণ্য বাজারজাত করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে দেশীয় শিল্পের ক্ষতি হবে না বরং তা আরও বিস্তার লাভ করবে। সুসম বাণিজ্যনীতির ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে ১২ কোটি মানুষের শিল্প পণ্যের বাজার অন্যের দখলে চলে না যায়। এটা করতে না পারলে অর্থনীতিতে মহা বিপর্যয় ঘটবে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমাদের অবস্থান, আমাদের অর্থনীতির স্বাস্থ্য কেমন আছে তাও একবার খতিয়ে নেয়া দরকার। বলতে গেলে বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর রাষ্ট্র। রপ্তানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ অনেক বেশি ফলশ্রুতি হিসেবে প্রতি বছর বাণিজ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমরা দীর্ঘ ৩০ বছর পর্যন্ত বাণিজ্য নিজেদের অনুকূলে আনতে পারিনি। এ পর্যন্ত আমাদের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা। ২ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব ঘাটতি এবং বর্তমান সরকার জুলাই '৯৯ থেকে মে ২০০০ পর্যন্ত এই ১১ মাস ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে ব্যয় বেশি হচ্ছে কিন্তু রাজস্ব খাতে আয় বাড়ছেনা। নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্যে চলছে দেশের অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল। এদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে সেই পোশাক শিল্প আগামী ৬ মাসের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আগাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন পোশাক শিল্প সংগঠনের সভাপতি-আনিসুর রহমান সিনহা। তিনি ২০/০৫/২০০০ এক সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন। কারণ ১৯/০৫/২০০০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন সার্ব-সাহারা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৪৮ টি দেশের জন্য শুল্ক মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা দান সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষর দানের পর বাংলাদেশ অসুবিধায় পড়েছে। দেশে ইতিমধ্যে ৩০০ সোয়েটার কারখানায় বিপর্যয় শুরু হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দু'টিতে চলছে দুই মন্ত্রীর ঠাণ্ডা লড়াই। দেশ নিয়ে তারা এই মুহূর্তে ভাবছেন না। প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা কার খর্ব হলো, কার বড় হলো এই নিয়ে তাদের রাত দিন চিন্তা।

রপ্তানি বাণিজ্যে কূটনৈতিকদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে পেশাদার কূটনৈতিকদের দায়িত্ব অনেক, বিশেষ করে স্ব-স্ব দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরগুলি যাতে চাঙ্গা হয় তার প্রচেষ্টা গোটা বিশ্বে তারা চালায়। গোটা বিশ্বে এই তৎপরতা লক্ষণীয়, কিন্তু বাংলাদেশ এই ব্যাপারে দারুণভাবে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের কূটনিতিকরা মূলত নিজেদের আখের গোছানোর লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছেন। অন্যদিকে ভারতের সাথে বাংলাদেশের অসম বাণিজ্য চলছে যা বাংলাদেশের জন্য অনুকূল নয়। বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যে ভারসাম্যহীন বাণিজ্য বাংলাদেশের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। দু দেশের বাণিজ্যের প্রতিকূলতা দূর করার জন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের পণ্যের জন্য শূন্য ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণ, যার এখনো কোন অগ্রগতি

www.pathagar.com

হয়নি। এই সুবিধার বিনিময়ে ভারত চাচ্ছে ট্রান্সশিপমেন্ট ও অবাধ সীমান্তে বাণিজ্যের সুবিধা। চোরাচালান রোধে ভারতীয় শাসকদের বড় একটা আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। কারণ এক্ষেত্রে ভারতীয়রাই লাভবান, বাংলাদেশ নয়।

দুঃখজনক যে আজকের এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত বর্তমান কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রাখা বৈদেশিক রিজার্ভ ১৪৭ কোটি ৬৭ লাখ ডলার এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানের রিজার্ভ দিয়ে কেবলমাত্র দু'মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী কমপক্ষে তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান রিজার্ভ থাকলে তাকে নিরাপদ মাত্রা হিসেবে ধরা হয়। গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ তিন মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান হচ্ছে না। খেলাপি ঋণেও জর্জরিত দেশের ব্যাংকিং সেক্টরগুলো, ফলে ব্যাংকের আয়ের পথগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমরা পিছিয়ে থাকব যতদিন পর্যন্ত না উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে দেশের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির নীতিনির্ধারকরা সফলতার সাথে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করতে না পারে। বিশ্ব বাজারে আমাদের পণ্য সামগ্রী টিকে থাকতে পারবে না, এমনকি নিজের দেশেও আমাদের পণ্য সামগ্রী টিকিয়ে রাখতে পারব না, যতদিন পর্যন্ত না আমরা অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলোর যথার্থ মূল্যায়নে ভূমিকা রাখতে না পারবো।

www.pathagar.com

মুক্ত বাজার অর্থনীতির রূপরেখা প্রসঙ্গে

গোটা বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতি যাতে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আসতে পারে, দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে পারে সেজন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুনিয়াতে এখন একলা চলার দিন বলতে গেলে প্রায় শেষ হয়ে গেছে যেটা অর্থনীতির জন্য আরও বেশি কার্যকর বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সে জন্য আমরা লক্ষ্য করছি মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণ যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে GATT (General Agreements on Tariffs and Trade)। বর্তমান বিশ্বে ১২৫ টি রাষ্ট্র GATT এর সদস্য। ১৯৯৫ সালে GATT বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থা World Trade Organisation নামে রূপান্তরিত হয়। GATT এর মূল উদ্দেশ্য সারা বিশ্বের বাণিজ্যকে ক্রমান্বয়ে উন্মুক্ত করা, শুল্ক হার কমিয়ে বিশ্বকে ক্রমান্বয়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাবেও কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মুক্ত বাজার অর্থনীতির অনুকূলে কাজ করার লক্ষ্যে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংস্থাগুলো হলো SAPTA, NAFTA, ASEAN। সম্ভবত অতি সহসাই ইউরোপ চলে যাবে একক মুদ্রায়। অবাধ বাণিজ্যের লক্ষ্যে শুল্ক মুক্ত পণ্যের দেশ বলে ঘোষণা দেবেন নিজেদেরকে। এজন্য গঠিত হয়েছে Association of South East Asian Nations (ASEAN)। মুক্তবাজারের প্রায় অভিন্ন শর্ত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে North American Free Trade Agreement (NAFTA)। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে South Asian preferential Trade Agreement (SAPTA)। গঠিত হয়েছে Latin American Free Trade Agreement (LAFTA)। আরও রয়েছে এশীয় ও প্যাসিফিক অর্থনৈতিক গোষ্ঠী। এ সমস্ত সংস্থার সবারই উদ্দেশ্য মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিকাশ সাধনে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বময় কার্যকরী ভূমিকা পালন করা। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন আঞ্চলিক বাধা ও অসামঞ্জস্য বৈষম্যগুলি কমিয়ে আনা সম্ভব হলেই মুক্ত বাজারের ইতিবাচক ফল আমরা আশা করতে পারবো। আজকের দিনে অর্থনীতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টির প্রয়োজন, যা উত্তম ও নির্ভেজাল পরিবেশ বজায় রেখে এবং ন্যায় নীতিতে সমর্থনযোগ্য এমন ধরনের আয়-ব্যয় ও বন্টনের নিয়ম যা গড়ে তুলবে বৈষম্যহীন এক বিশ্ব অর্থনৈতিক সমাজ কাঠামো যেখানে আর কখনো আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে না। সুসম অর্থনীতির জোয়ার বইবে গোটা পৃথিবীতে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে বাংলাদেশ সরকারের গৃহিত কর্মসূচি

বিশ্ব ব্যাংক ও আই. এম. এফ. আশির দশকে বাংলাদেশে মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু সংস্কার কর্মসূচির কথা বলেছেন। সংস্কার কর্মসূচির মূল ভিত্তি ছিল—১।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিকায়ন (Globalization) ২। উদারিকরণ (Liberalisation) ৩। নিয়ন্ত্রণ মুক্তকরণ (Deregulation)। ৪। ব্যক্তিগতায়ন (Privatization)। মুক্ত বাজারকে ত্বরান্বিত করতে হলে উল্লেখিত নিয়ম ৪ টি মেনে চলা আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ আহবান করে। পুঁজি বাজারকে বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। বাংলাদেশ ১৯৯৪ সালে গ্যাট-এ স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সাপ্‌টা কার্যকর করে বাংলাদেশ নিজেকে সর্বপ্রথম একই সংগে দক্ষিণ এশিয়া এবং বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির আলোকে আমাদের করণীয়

মুক্ত বাজার অর্থনীতি নিয়ে এখন তুমুল বিতর্ক চলছে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে। যতই বিতর্ক হোকনা কেন আমরা পিছনে ফিরে যেতে পারবনা, সামনে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা পৃথিবী নামক গ্রহের বাইরে যেতে পারব না। গোটা বিশ্ব যখন মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছে সেখানে আমরা এর বিরুদ্ধচারণ করলে হিতে বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে। বরং আমরা মুক্ত বাজারকে আমাদের পক্ষে আনার প্রশ্নে কিছু নিয়মের কথা বলতে পারি। যেমন—

১। সংস্কার কর্মসূচি শ্লথভাবে নয় বরং পূর্ণভাবে চালু করতে হবে।

২। গ্যাট বাস্তবায়নে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৩। বিদেশী বিনিয়োগের কথা বললেই চলবে না, বরং এর সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় কল্পে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪। রাজনৈতিক পরিবেশ সুস্থতা বজায় রাখা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাধীন ভাবে গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৫। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে বাণিজ্যে সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

৬। রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করতে হবে। এ ব্যাপারে অধিক রপ্তানির জন্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। লোকসানী সরকারি খাত বন্ধ ঘোষণা করতে হবে।

৮। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বন্ধ করতে হবে।

৯। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের ফলে যে লুটপাট হয় তা বন্ধ করতে হবে।

১০। পণ্য চলাচল ও বণ্টনের সকল ব্যবস্থার আধুনিকায়ন করতে হবে।

১১। স্যাটেলাইট মিডিয়ার মাধ্যমে মুক্ত বাজার বিষয়টির উপর শিক্ষামূলক ধারা বিবরণী বার বার প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। সীমান্তে চোরাচালান সহ বেআইনী সকল ধরনের ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

১৩। ব্যাংকিং ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে হবে।

১৪। হরতাল নামক রাজনৈতিক ব্যাধি থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে হবে।

১৫। নাগরিক চেতনাবোধ ও দেশপ্রেম জাতির মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কার্যকরী ভূমিকা

দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতির কার্যকরী ভূমিকা না থাকার কারণে এর কল্যাণমুখী সফলতা থেকে আমরা এখনো বঞ্চিত। মুক্ত বাজার অর্থনীতি যেভাবে কার্যকরীর কথা ছিল তা হয়নি। এর মূল কারণ হলো—

(ক) সংস্কার কর্মসূচির সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের দৃঢ়তার অভাব।

(খ) অলাভজনক রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পিছনে অহেতুক কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক পর্যায়ে আনার কোন প্রয়াস নেই।

(গ) ব্যবসা প্রশাসনে অদক্ষ ও অসৎ লোকের বিচরণ।

(ঘ) শিল্প প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের চাপ।

(ঙ) রাজনৈতিক সুস্থতার অভাব।

(চ) সার্কভুক্ত দেশগুলোর সাথে অসম বাণিজ্য।

গ্যাটের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে বা সাপ্‌টার মাধ্যমে আঞ্চলিকভাবে যে মুক্ত বাজার চালু হওয়ার কথা ছিল তার গতিও সন্তোষজনক নয়। এখানেও সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থাও মুক্ত বাজার অর্থনীতির বিপক্ষে অবস্থান নেয়। রপ্তানির চেয়ে আমদানি দ্বিগুণ হওয়ায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি আমাদের অনুকূলে প্রভাবিত হয়নি। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পশ্চাৎপদতা থাকার কারণে মুক্তবাজারে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। এমনকি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাবহেতু বিশ্ববাজার প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুফল দেখা যায় বিশেষ করে আমদানি বাণিজ্য বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তি বিনিময়, এনজিওর বাণিজ্য তৎপরতা বৃদ্ধি, অবাধ তথ্য প্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি খাতের বিকাশে কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। তবুও মুক্ত বাজারের ব্যাপারে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

যদি সরকার সুচিন্তিতভাবে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে নিজেদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চালায় তাহলে মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে আমরা পিছিয়ে থাকবো না। বরং আমরা নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবো।

www.pathagar.com

বাজার অর্থনীতি ঃ নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ

আধুনিক বাজার অর্থনীতি আমাদের প্রতিদিনকার জনজীবনের সাথে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাজার ব্যবস্থাটা মধ্যযুগ শেষ হওয়ার পর এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে এর যাত্রা শুরু। বর্তমানে শিল্প বাজার অর্থনীতি মুক্ত বাজার অর্থনীতির কারণে প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হয়ে পড়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কেউ এই প্রতিযোগিতায় নিজের অর্থনীতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারছে কেউ অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ পরনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হচ্ছে। দুর্বল অর্থনীতি স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্যও হুমকীস্বরূপ। দুর্বল অর্থনীতি পরাধীনতার নামান্তর।

বাজার অর্থনীতি বলতে মূলত বুঝায় পণ্যের মূল্য, উৎপাদনের পরিমাণ অর্থাৎ কি পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে বাজার নিজেদের অনুকূলে রাখতে হলে এবং উৎপাদিত পণ্য প্রত্যেকের উপার্জন নির্ধারিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারছে কিনা। এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে যারা বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পেরেছে তাদের বাজার অর্থনীতি বলতে গেলে সুস্থ। বাজার অর্থনীতিতে তারাই এগিয়ে যারা আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে নিজেদের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করতে পারেন। বিগত দু'দশক থেকে গোটা বিশ্বে মুক্ত বাজার অর্থনীতির একটি ব্যাপক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে এবং এই অর্থনীতির বৃহৎ অংশের চারণ ক্ষেত্র হলো এশিয়া মহাদেশের উন্নয়নশীল দেশসমূহ।

কৃষিপণ্য ও শিল্পপণ্য উৎপাদনে যারা সমানভাবে সফলতা অর্জন করতে পারেন তারাই অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবেন এটা নিশ্চিত করে বলা যায়। রাজনৈতিক সহিংসতা ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতা যে সমস্ত দেশে বেশি সে সমস্ত দেশের বাজার অর্থনীতি কাঠামোগতভাবে দুর্বল হয়। বাংলাদেশে সেরকম একটি আলামত স্বাধীনের পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আমাদের দেশে মানুষ যে হারে বাড়ছে, কৃষি জমি সে হারে বাড়েনি, বরং কৃষি জমি কমছে, পরিবেশ হারাচ্ছে ভারসাম্যতা, উৎপাদনে স্থবিরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রয়োজন যেখানে বাড়তি খাদ্যের সে হারে বাড়ছে না উৎপাদন। উৎপাদন থাকছে সীমিত। এমনি এক পরিস্থিতিতে বাজার অর্থনীতি দেশের অনুকূলে নয় বরং বিদেশী সাহায্য নির্ভর বাজার অর্থনীতিতে রূপ নিয়েছে। বিদেশী পণ্যের অবাধ অনুপ্রবেশের কারণে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা স্বদেশী পণ্য। দেশী পণ্যের চেয়ে বিদেশী পণ্যের মূল্য আনুপাতিক হারে কম বিধায় ক্রেতাসাধারণ বিদেশী পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে বেশি। কনজিউমারসরা চাইবে কম মূলে ভাল জিনিস ক্রয় করতে। অর্থনীতির সংজ্ঞাও এটি।

www.pathagar.com

দেশীয় পণ্যের বাজার ধরে রাখার জন্য দু'টি কাজ আমাদের করতে হবে। প্রথমে পণ্যের গুণগতমান এবং পণ্য মূল্য ক্রেতা সাধারণের সামর্থ্যানুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। বিদেশী পণ্য যাতে বাজার দখল করতে না পারে অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে। এমন কোন পণ্য আমদানি করা উচিত হবে না যা দেশে উৎপন্ন হয়। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি তারা এভাবে চালু করেছেন। জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এমন কোন নীতি তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেনি। ভারত বহির্বিশ্ব থেকে কোন পণ্যই আমদানি করে না যেটা নিজের দেশে উৎপন্ন হয়। ভারতে বিদেশী সিগারেট ও কসমেটিক নিষিদ্ধ। ভারতের একজন সচিব নিজের দেশে তৈরি সিগারেট খান। ১৫/২০ হাজার টাকা বেতন পান এমন লোকও পাতার বিড়ি খান। জাতীয় স্বার্থে দৈনন্দিন জীবনে তারা ভারতীয় পণ্য ব্যবহারে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলেছেন। আমাদেরও সেধরনের একটি অর্থনৈতিক কমিটমেন্ট রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে। ১২ কোটি মানুষকে জাতীয় স্বার্থে স্বদেশী পণ্য কেনার মানসিকতা নিজেদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। আগে দেশ বাঁচাতে হবে তারপর ব্যক্তি চিন্তা। দেশ ভাল থাকলে গোটা জাতি ভাল থাকবে। এই ধরনের মানুষিকতার একটি বিপ্লব আমাদের চিন্তা চেতনায় জাগ্রত করতে হবে।

মূল কথা হলো অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বাংলাদেশের দক্ষতা অর্জন করা দরকার অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। অধিক পরিমাণ বিদেশী সাহায্য তথা দাতা গোষ্টি, বিশ্ব ব্যাংক, আই.এম.এফ এর থেকে পাওয়ার প্রচেষ্টা না করে বরং তৈরি পোশাক রপ্তানির কোঠা বাড়ানো এবং শ্রমিকদের বহির্বিশ্বে নিয়োগ বাড়ানো অর্থাৎ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

দেশের চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমতা আনতে হবে। ডিমান্ড এবং সাপ্লাইর মধ্যে যদি সমতা না থাকে তাহলে বাজার অর্থনীতিতে সমস্যা সৃষ্টি হবে, বাজারে বিদেশী পণ্যের অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং সরকারও বাধ্য হবে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি করতে। সোজা কথা রপ্তানির চেয়ে যদি আমদানির পরিমাণ বেশি হয় তাহলেই বৈদেশিক রিজার্ভ ফান্ডে টান পড়বে। রিজার্ভ ফান্ড বাড়বেনা তা আরও কমে যাবে। বিগত ৫ বছর ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সেরকম আলামত দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক সময়ের একটি বুলেটিনে এই তথ্য বেরিয়েছে। আজকের এই নিবন্ধ লেখা পর্যন্ত বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ফান্ড ১৭০ কোটি ডলারের নিম্নে অবস্থান নিয়েছে। এ সময়ে দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটেছে কয়েকবার। এগুলো অর্থনীতির জন্য সুখকর বিষয় নয়। দুঃখজনক যে বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ৬০ ভাগ আসে বিদেশী সাহায্য থেকে এটাও অর্থনীতির জন্য শুভ নয়। আরও দুঃখজনক যে অনুৎপাদনশীল খাতে দেশে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে বেশি, বিশেষকরে হাউজিং

www.pathagar.com

ব্যবসার মাধ্যমে কালো টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং বিদেশী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য বিলাসবহুল আধুনিক বহুতল বিশিষ্ট সুপার মার্কেট নির্মাণ করা হচ্ছে। এই দুই সেক্টরে অর্থ বিনিয়োগের চাইতে যদি অধিক পরিমাণে গ্রামে গঞ্জে ক্ষুদ্র ও মাঝারী বা ভারী শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে দেশের বাজার অর্থনীতি অন্য যেকোন দেশের সাথে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারতো। স্বাধীনভাবে কোন দেশকে বীরের মতো নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই তাকে অর্থনীতির সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে। কোন পরিবেশে কোন টেকনোলজী ব্যবহার করলে উৎপাদন দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে এবং জমির ক্ষেত্রে যান্ত্রিক চাষাবাদ, উন্নতমানের রাসায়নিক সার, উন্নতমানের কীটনাশক ওষুধ, উন্নতমানের বীজ রোপণ ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ফলন বাড়বেনা। ফলন না বাড়লে উৎপাদনও বাড়বেনা। বাজার অর্থনীতিকে নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য কৃষি এবং শিল্প এই দুই দিকেই সমান দৃষ্টি রাখতে হবে। উৎপাদন ব্যহত হয় এমন সব কার্যকলাপ রাষ্ট্রীয়ভাবে বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে রাজনৈতিক সহিংসতা, ট্রেড ইউনিয়নের অবৈধ তৎপরতা, চাঁদাবাজ, হরতাল, ধর্মঘট ইত্যাদি যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে চলার প্রচেষ্টা করতে হবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিরোধী শক্তিগুলোকে জাতীয় স্বার্থে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। বাজার অর্থনীতি থেকে সুফল পেতে চাইলে আরও অনেক ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অত্যাবশ্যক—ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা তখন সহজ হবে।

বাজার অর্থনীতিকে নিজেদের অনুকূলে আনার সকল উপকরণ আমাদের দেশে বিদ্যমান রয়েছে। তার একটি হলো মানব সম্পদ। ১২ কোটি মানুষের হাতকে যদি ১২ কোটি শ্রমিকের হাতে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব। জনশক্তি এতো স্বল্পমূল্যে পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই বললেই চলে। এটা রপ্তানির মাধ্যমেই হউক অথবা নিজের দেশে ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার মাধ্যমেই হউক বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। এক কথায় উৎপাদনের সকল উপকরণ ভূমি, শ্রম, পানি ও খনিজ পদার্থ সবকিছুই এখানে বিদ্যমান। শুধু প্রয়োজন এর যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োগ। এই কাজটি যথানিয়মে করতে পারলেই বাজার অর্থনীতির প্রক্রিয়াটি আমাদের অনুকূলে ধাবিত হবে এবং আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সক্ষম হবো।

www.pathagar.com

উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি নাকি উন্মুক্ত বর্ডার অর্থনীতি

দেশে এখন যে প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি চলছে তাকে উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি না বলে বরং বলা যায় উন্মুক্ত বর্ডার অর্থনীতি। গোটা বাংলাদেশের চার ভাগের তিন ভাগের বেশি এলাকা ভারত দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র একটি অংশ মায়ানমার রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। এই বিশাল সীমান্ত এলাকাগুলো বলতে গেলে প্রায় অরক্ষিত, ফলে চোরাচালান রুট হিসেবে পরিগণিত হয়েছে সীমান্ত অঞ্চলসমূহ। কোটি কোটি টাকার শিল্পপণ্য পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিদিন। হুণ্ডি ব্যবসা ও চোরা চালান অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। ৪৯ টি চোরাচালানের রুট দিয়ে বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য আসছে বাংলাদেশে। চোরাচালান রুট দিয়ে এসে লাখের উপর বিদেশী শ্রমিক অবৈধভাবে বসবাস করছে বাংলাদেশে। তাদের টাকা সরকারের কোষাগারে থাকছে না। পাচার হয়ে যাচ্ছে বিদেশে। পৃথিবীর কোন দেশে বাণিজ্য মেলার নামে এতো বেশি বিদেশী পণ্য বিক্রি হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে প্রতিবছর এ ধরনের মেলা হচ্ছে। অবাক হতে হয় শুনে থাইল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুর বছরে ফুল রপ্তানি করে ৩ থেকে ৪ শ' কোটি টাকা আয় করে। সেখানে আমরা কেন শাক-সবজি রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারব না।

দেশের ৩ হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজারে ১২'শ কোটি টাকার ওষুধই আসছে চোরাই পথে (দৈনিক জনকণ্ঠ ১২-০৬-২০০০) দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী থাকা সত্ত্বেও (বি এস এফ ও বি ডি আর) তাদের নাকের ডগার উপর দিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীরা সরকারকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে এই অবৈধ ব্যবসার বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা আয় করে নিচ্ছে। এর ফলে সরকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে দেশের পণ্য দ্রুত বাজার হারাচ্ছে তদস্থলে বিদেশী পণ্য জায়গা দখল করে নিচ্ছে। এর ফলে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ দেশের উঠতি শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক বহু বছর ধরে সক্রিয় রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চোরাচালান ব্যবসার দলপতিরাই এই ষড়যন্ত্রের হোতা বলে ধরে নেয়া যায়। দুই দিক থেকেই এরা টাকা রোজগার করে। ভারতীয় পণ্যের অসম প্রতিযোগিতার মুখে ছোট বড় মাঝারী সব শিল্পই আজ মারাত্মক হুমকির পর্যায়ে এসে অবস্থান নিয়েছে। দৈনিক ইনকিলাব (০৬-০৭-২০০০) লিখেছে ভারত থেকে অবৈধ পথে প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন কোম্পানির প্রিন্টেড লেবেল পুলিশ আটক করেছে। এ ধরনের প্রিন্টেড লেবেল প্রতিদিন বর্ডার অতিক্রম করে এদেশে আসছে। বি আই ডি এস এর ১৯৯৮ইং স্টাডি জরীপে দেখা যায় Informal Trade হিসেবে ভারত থেকে অবৈধ পথে ৭০ প্রকার পণ্য বাংলাদেশে অবাধে প্রবেশ করছে—অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে

www.pathagar.com

যাচ্ছে মাত্র ১৫ প্রকারের পণ্যসামগ্রী। এই অবৈধ বিনিময়ে কোন সরকারই ট্যাক্স পাচ্ছে না। মাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশ থেকে ভারত এবং ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার একটা সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে। শত শত নারী পুরুষ প্রতিদিন এভাবেই আশা-যাওয়া করছে সীমান্ত পথ দিয়ে। দরকার হয় না পাসপোর্টের, গুনতে হয়না আড়াইশো টাকা ট্রাভেল ট্যাক্সের [দৈঃ মাঃ জঃ ১১/৮/২০০০]।

সম্প্রতি দেশের বৃহৎ চিটাগাং স্টীল মিল যেটি ১৯৬৭ ইংরেজিতে ২০০০ কোটি টাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই মিলটি ১৯৯৯ থেকে তাদের উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ ভারতীয় ম্যাকন ইণ্ডিয়া লিমিটেড -এর ষড়যন্ত্রের শিকার এই মিলটি। শোনা যায় ইস্পাত শিল্পের বাজারও উক্ত কোম্পানিটি দখল করে নিয়েছে (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৫-০৭-২০০০)। দুঃখজনক যে বাংলাদেশ আজ প্রডিউসার নয় কনজ্যুমারের দেশে পরিণত হয়েছে। এই অসম বাণিজ্য প্রতিযোগিতাকে অনেকে মুক্ত বাজার অর্থনীতি বলে ঢালাওভাবে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় বাজার স্বদেশী পণ্যের স্থলে অবৈধভাবে আসা চোরাচালানী পণ্য দ্বারা পরিপূর্ণ থাকলে সেটা কি করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি হয়, বুঝে আসে না। সহজ অর্থে ম্যাক্রো ইকনোমিক স্ট্যাবিলিটির বৈশিষ্ট্যও হলো পণ্যের অবাধ চলাচলে অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে পণ্যের অবাধ চলাচল বৈধভাবে চালু রয়েছে সে সমস্ত দেশ সমভাবে উপকৃত হয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে। নিজস্ব শিল্পের ও বাণিজ্যের প্রটেকশন না থাকলে তাকে বাজার অর্থনীতি বলে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের শিল্প ও বাণিজ্যের স্বার্থে এই নিয়ম মেনে চলছে। আমাদেরও সেই নিয়ম মেনে চলতে হবে।

বাজার অর্থনীতি থেকে সুফল পেতে বহুক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আবশ্যক। কিভাবে আমরা স্বজ্ঞানে-অজ্ঞানে বিদেশী পণ্যের সেবা করে যাচ্ছি তার একটি ছোট্ট উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি, নগরীর অভিজাত এলাকায় যে সমস্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার অধিকাংশ দোকানগুলিতে বিদেশী পণ্যে ঠাসা থাকে। ধানমণ্ডির রাপা প্লাজা, স্টপ ইন শপ, গ্রেস, বনানীর হোয়াইট ফ্যাশন, নিউ বেইলী রোডে স্টারডাস্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের মতো গুলশান বনানী ও উত্তরায় রয়েছে এ ধরনের ডজন ডজন দোকান যেখানে স্বদেশী পণ্য খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। এ সমস্ত দোকানে বিদেশী পণ্যের গায়ে ডলারের স্থানীয় মুদ্রামানের চেয়েও দাম বেশি লেখা রয়েছে। Stop in Shop (ধানমণ্ডির ২৭ নম্বর) দোকানের ম্যানাজারকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম দামের মধ্যে এরকম হেরফের কেন? উত্তরে সে বলল প্রতিটি পণ্যের ৩ থেকে ৫ টাকা বেশি মূল্য ধরে দামের লেবেল লাগানো হয়েছে। বিদেশী পণ্যের উপর ফিক্সড রেট কম্পিউটারে ছাপানো কাগজের বাড়তি খরচ কনজ্যুমারদের সুবিধার্থে করা হয়েছে। তদুপরি সংসারের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস নির্দিষ্ট একটি দোকান থেকে সংগ্রহ করা যায়। এ সমস্ত সুবিধার কারণেই কিছু দাম প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশি রাখা হয়েছে। এই যুক্তিটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা সচেতন পাঠক সমাজের উপর ছেড়ে দিলাম। বিষয়টি নিয়ে তারাই ভাববেন।

www.pathagar.com

আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, জাতিসংঘের সনদপ্রাপ্ত দেশগুলির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আমাদের অবস্থান—অর্থাৎ ১৭৪ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬ তম। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এক্ষেত্রে আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী নেপাল ও ভূটানের মতো ভূমিবেষ্টিত দেশও এখন আমাদের অনেক উপরে চলে গেছে। ওদের যা আছে তার চেয়েও আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশি রয়েছে। খনিজ সম্পদও বেশি রয়েছে। রয়েছে উর্বর ভূমি ও পানি সম্পদ। এর চেয়েও বেশি রয়েছে মানব সম্পদ। এতো সস্তায় শ্রম বিশ্বে আর কোথায়ও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া দেশের মানুষও বোকা নয়। আমাদের রয়েছে প্রতিষ্ঠিত ও উদীয়মান উদ্যোক্তা শ্রেণী। জাতিগত কোন সমস্যা নেই। তার পরেও আমরা পিছিয়ে রয়েছি। এর একটি মাত্র মূল কারণ আর সেটি হলো রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। সরকার ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যে সহমর্মিতা, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অভাব ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাও লক্ষণীয়। গণতন্ত্রের নামে গণতান্ত্রিক ব্যভিচার চলছে প্রায়ক্ষেত্রে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে পরিচালনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। অনেক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ মেধাবী ছেলে কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে মাদকাশক্তি, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীর পথে পা বাড়িয়েছে। পুঁজি বিনিয়োগের পরিবর্তে ব্যবসায়ীরা পুঁজি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে। পাচার করে দিচ্ছে সেই পুঁজি বিদেশে আত্মীয়-স্বজনদের কাছে। এসব জাতীয় সমস্যা নিয়ে গঠনমূলকভাবে ভাবার মতো কোন লোক দেশে আছে কি?

আমরা মুক্ত বাজার অর্থনীতি, স্বনির্ভর অর্থনীতির যত গাল ভরা স্লোগানের কথা বলি না কেন—মূলত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ও সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বিশ্ব তথা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আশংকামূলক বলে ধরে নেয়া যায়। এখনই শোনা যাচ্ছে ২০০৫ সালের শুরু থেকে তৈরি পোশাকের কোটা বাংলাদেশে থাকবে না। এই ব্যবসা তখন অন্যদের হাতে চলে যাবে। তারাই তা অবাধে তখন রপ্তানি করবে। আমাদের ৭৫% রপ্তানি আয় অর্জনকারী তৈরি পোশাক শিল্পের তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে সেই কথা ভাবলে গাঁ শিউরে উঠে। আমাদের ভৌত ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, পরিবেশ, শিল্প ও রপ্তানির ভিত্তি খুবই দুর্বল ও ভঙ্গুর। আমরা আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা খুব জোর গলায় উচ্চারণ করি কিন্তু বাস্তবে আদৌ কোন বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করতে পারিনি। সার্কভুক্ত কোন দেশের স্বার্থেই আমাদের বাণিজ্যিক ভারসাম্য অনুকূল নয়। একমাত্র ভারতের সাথেই আমাদের বাণিজ্যিক ঘাটতি ১৯৯৪-৯৫-এ ৬৬০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১৯৯৮-৯৯ সালে ১১৮৩ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। এই সময়ে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ২৯ মিলিয়ন ডলার থেকে ৪৮ মিলিয়ন ডলারে। অন্যদিকে দীর্ঘ সীমান্ত দিয়ে আসছে অফিসিয়াল আমদানির চেয়েও অধিক পরিমাণ পণ্যসামগ্রী যা সম্পূর্ণ অবৈধ। এতে একদিকে বাড়ছে রাজস্ব ঘাটতি, অন্যদিকে অপচয় হচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার, নষ্ট হচ্ছে ধাতব সম্পদ এবং শুল্কবিহীন আমদানিকৃত শিল্পসামগ্রী। এই অসম

www.pathagar.com

বাণিজ্য মারাত্মকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে বৈদেশিক রিজার্ভের পরিমাণ ১৪৫·২৬ কোটি ডলারে এসে পৌঁছেছে। বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে মাত্র ২/৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। বিগত সারে চার বছরে ১৯ বার টাকার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। বর্তমানে বাণিজ্য ঘাটতি ১৮ হাজার কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাজেটে ২ হাজার ৪ শ ৪০ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব ঘাটতি দেখা দিয়েছে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে। শিল্পের প্রবৃদ্ধি নেই, বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে গেছে। এমনি এক জটিল অবস্থায় দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতীয়নীতি, অবস্থান ও প্রচেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম বলে দেশের বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। এই সময় যদি আমরা আভ্যন্তরীণভাবে দ্বিধা-বিভক্ত ও দুর্বল থাকি তাহলে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক কোন আলোচনাই দেশের জন্য বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সুবিধা, বৈদেশিক সম্পদ ও সাহায্য আহরণের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম সুবিধা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সংকট ঃ মুক্ত বাজার অর্থনীতির জন্য হুমকিস্বরূপ

নিজের অবস্থান সুদৃঢ় না করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করা আর নিজের পায়ে কুড়াল মারার সমতুল্য। দেশের ১২টি সেক্টর কর্পোরেশনের মধ্যে ১০টি সেক্টর কর্পোরেশন প্রতি বছর লোকসান দিয়ে যাছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০-এ যে তথ্য প্রকাশ হয় তাতে দেশের ১৫ টি রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ('৯৯-২০০০) লোকসানের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৬ শত ৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

বিগত সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান একটি নিয়মের আওতায় মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালুর কথা বলেছেন। অথচ বর্তমান সরকার নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে উন্মুক্ত বর্ডার অর্থনীতি চালু করেছেন এবং সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন বিএনপি সরকারের ঘারে অর্থাৎ তাদের সকল ব্যর্থতা, বিগত ২১ বছরের সরকারের ঘারে চাপিয়ে দিয়ে তারা সাধু ও দোষমুক্ত থাকার প্রয়াস চালায়। যেমন ধরুন পার্বত্য চুক্তি করেছে আওয়ামীলীগ। এটা গোটা বিশ্ববাসী জানে, কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার বলেছে এই চুক্তির পথ বিএনপি-ই তৈরি করে দিয়েছে—অর্থাৎ বিগত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমদ সাহেব নাকি সন্তু লারমা ও তার ভারতীয় প্রভুর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করেছেন। সংলাপ করা, আলোচনায় বসা এবং চুক্তিতে সই করা যে এক জিনিস নয়—এই কথা কে বুঝাবে আওয়ামীলীগ সরকারকে। বর্তমান সরকারের স্বভাবগত একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, সেটা হলো নিজেদের তৈরি অপকর্ম, অপশাসন অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তি বোধ করা। এটি একটি বাতিক ও ম্যানিয়া রূপ নিয়েছে তাদের। কন্যার মত পিতা শেখ মুজিবেরও এই গুণটি ছিল। তিনি সবসময় বলতেন (বিশেষ করে তার সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলে) খানসেনারা সব শেষ করে দিয়ে গেছে। আমি তিন বছর কিছুই দিতে পারব না। অথচ তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী কিসিনজারের মতে বাংলাদেশে যে সাহায্য দেয়া হয়েছে তা দ্বারা নতুন আরেকটি বাংলাদেশ গড়া যায়। তিনি আবার দুঃখ করে এ কথাও বলেছেন এত সাহায্যের পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি Bottomless basket-এ রূপ নিয়েছে। কথাগুলি সে সময় পত্রিকায় এসেছিল। যতই সাহায্য দেই না কেন রাষ্ট্রীয়ভাবে সেটা থাকে না। ব্যক্তি খাতে সেটা ব্যয় হয়। ঝুরি বা ব্যাগে যদি ছিদ্র থাকে যতই পণ্যসামগ্রী তাতে পূর্ণ করিনা কেন তা ঐ ছিদ্র দিয়ে পড়ে যাবে। আওয়ামীলীগের আমলে বাংলাদেশের রূপ নিয়েছিল সে রকম একটি অবস্থায়। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী সে কথাই প্রতিধ্বনি করেছিলেন Bottomless

www.pathagar.com

basket বলে। প্রসঙ্গের আলোকে যে কথাটি বলতে যাচ্ছি তা হলো শিকড় শক্ত না করে অর্থাৎ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিত মজবুত না করে, রুগ্ন শিল্পগুলোকে বাঁচানোর চেষ্টা না করে মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে ঢালাওভাবে বিদেশী পণ্য বাজারজাত করে মূলত আমরাই পিছিয়ে যাব।

রাষ্ট্রীয় শিল্পগুলোকে লাভজনক পর্যায়ে আনার জন্য সঠিক ও সুদৃঢ় নীতিমালা সরকারি পর্যায়ে জরুরিভাবে চালু করতে হবে। বিগত সরকারের দোষত্রুটি অন্বেষণ নয় বর্তমানে যারা ক্ষমতায় তাদের এ ব্যাপারে কি করার রয়েছে সেটাই জাতি দেখতে চায়। আহম্মকরাই অন্যের দোষ দেয়, গুণিরা এই ভুলটা করে না। রাষ্ট্রায়ত্ত ও রুগ্ন শিল্পগুলোকে যদি উৎপাদনমুখী ও লাভজনক অবস্থায় আনা যায় কোন আইন কার্যকরী করার মাধ্যমে ও প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়িয়ে, এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভব হলে সেটাই হবে বর্তমান সরকারের একটি বড় উপার্জন। কে কি করল সেটা বড় কথা নয় আমি কি করছি সেটাই বড় কথা।

শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্প নীতি আছে বটে কিন্তু সেটা কাগজে কলমে, বাস্তবে কার্যকরী থাকলে সেক্টর কর্পোরেশনগুলোর ক্ষতির অংক নয় বরং লাভের অংক বাড়তো। ৯ আগস্ট ২০০০ শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের এক পর্যালোচনা বৈঠক সঠিক ও সুদৃঢ় নীতিমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। শিল্পমন্ত্রী, শিল্প সচিব এবং মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবগণসহ সেক্টর কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দ উক্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এ ধরনের বৈঠক অতীতের সরকারও করেছেন। বর্তমান সরকারও করছেন। কিন্তু আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করছি যে জাতির এই বড় ইস্যুটি নিয়ে শুধু আমরা একে অপরের দোষত্রুটি অন্বেষণ করে সময় ক্ষেপণ করছি। যেমন ৯ আগস্ট ২০০০ শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল সাহেব উক্ত বৈঠকে বলেছেন বিএনপি সরকারের কারণেই নাকি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর আজকের দৈন্যদশার রূপ নিয়েছে। আমাদের এই আচরণের উত্তরণ ঘটানোর দরকার। কিভাবে রুগ্ন শিল্প বিশেষ করে খুলনা নিউজপ্রিন্ট, আদমজী জুট মিল, চিনি মিল, বিসিআইসির রুগ্ন অবস্থার উত্তরণ তথা কর্পোরেশনের লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলোকে চিহ্নিত করে যুগোপযোগী আইন প্রবর্তন করে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলার একটি শক্ত কাঠামো তৈরি করে যেতে পারলেই সেটা মন্ত্রী তোফায়েল সাহেবকে মনে রাখার মত একটি কাজ হতো। আমাদের নীতিবোধ নিয়ে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে কর্মরত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাংলাদেশ নীতিগতভাবে জ্বালানি খাতের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করলেও এর বাস্তবায়নের অবস্থা হতাশাব্যঞ্জক। সাম্প্রতিক কালের বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বাংলাদেশে প্রতি বছর এক শত কোটি মার্কিন ডলারের (৫৪'শ কোটি টাকা) উৎপাদন ক্ষতি হচ্ছে।

www.pathagar.com

১৩ আগস্ট, ২০০০ টাকার ১৭-তম অবমূল্যায়নের কারণে এখন এক ডলার সমান স্থানীয় টাকায় সর্বমোট ৫৪ টাকা দিতে হবে জনগণকে। ৫১ টাকা থেকে একলাফে ৫৪ টাকা হয়ে গেছে অর্থাৎ ৩ টাকা বেড়ে গেছে। সাড়ে ৪ বছরে টাকার মূল্য কমে গেছে মোট ১৩ টাকা অর্থাৎ আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে প্রতি বছর টাকার দাম ৩ টাকা হারে কমে যাচ্ছে। বিএনপি সরকারের আমলের তুলনায় আওয়ামী সরকারের আমলে প্রতিবছর ৩গুণ বেশি হারে টাকার দাম কমেছে। আমদানি নির্ভর এদেশে গুড়ো দুধ, রান্নার তেল, সাবান, জ্বালানি তেল, যাতায়াত ভাড়া, অধিকাংশ ভোগ্যপন্য যা আমদানি করে আনতে হয় তার সবগুলোই দাম বেড়ে যাবে, এটাই বাস্তব কথা। কাগজের দাম ইতিমধ্যেই বেড়ে গেছে। গ্যাস ইতিমধ্যেই ১৫ শতাংশ এবং জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি লিটার ২ থেকে ৩ টাকা হারে। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধিতে পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাবে। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে গ্রামাঞ্চলে এর প্রভাব ব্যাপকভাবে দেখা দিবে। কৃষি উৎপাদনে সেচ কাজে ডিজেল বেশি ব্যবহার হয় সুতরাং মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিরূপ প্রভাব ফেলবে কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে।

তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ এই তিনটি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষগুলো। সরকার জনগণকে একটি সুন্দর বাজেট উপহার দেয়ার কথা বলে ছলচাতুরি করে যে কাজটি করেছেন তা এখন ধরা পড়ে গেছে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও পাশাপাশি টাকার অবমূল্যায়নের কারণে। সরকারের এই অতিচালাকীর খেসারত দিতে হচ্ছে আজ জনসাধারণকে।

অনেকেই মনে করতে পারেন টাকার এই অবমূল্যায়নে রপ্তানির উন্নয়ন ঘটবে, অর্থাৎ রপ্তানির বৃদ্ধির জন্য এই অবমূল্যায়ন দরকার ছিল। আসলেই কি তাই? তাহলে বিগত ৪ বছরে ১৬ বার টাকার মান কমিয়ে রপ্তানি কি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে? আমরা জানি যে, আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের তুলনায় আমদানি বাণিজ্য সবসময় বেশি থাকে। ব্যালেন্স অব ট্রেড সবসময় প্রতিকূল ছিল। সেই স্বাধীনের পর থেকেই একই অবস্থা বিরাজমান। সুতরাং টাকার এই অবমূল্যায়নে আমদানি বাণিজ্যই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ আমদানি করতে হলে আমাদের বেশি টাকা দিয়ে পণ্যসামগ্রী কিনতে হবে ডলারের বিনিময়ে। এতে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে ঘাটতি দেখা দিবে। সুতরাং বলা যায় এই অবমূল্যায়নে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ কারণ তাদের আমদানি পণ্যসামগ্রী অধিক মূল্য দিয়ে বাজার থেকে কিনতে হবে। সুতরাং বার বার এই টাকার অবমূল্যায়নে দেশের জন্য, সাধারণ মানুষের জন্য কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না।

৭ আগস্ট ২০০০ বিসিআই বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ চেম্বার অব ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর ১৪-তম বার্ষিক সাধারণ সভা। উক্ত সভায় বিসিআই সভাপতি খন্দকার মোশারফ হোসেনসহ পরিচালক মণ্ডলীরা বলেন, বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। এ অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন ধরনের

www.pathagar.com

পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া আমাদের শিল্পকে বিশ্ববাজারের কঠিন প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষার ব্যবস্থা না করে হঠাৎ মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করায় শিল্পের উপর কঠিন আঘাত নেমে এসেছে। ফলে অধিকাংশ শিল্প কারখানা রুগ্নতায় ভুগছে। রুগ্ন শিল্পগুলোকে পুর্নবাসন করে লাভ জনক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। শিল্পায়নের সংকট ও উত্তরণের বিভিন্ন পন্থার আলোকে তারা যে কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন, তার সার সংক্ষেপ হলো, দেশের দ্রুত শিল্প বিকাশের স্বার্থে খেলাপি ঋণ সমস্যার সমাধান, ব্যাংকে সুদের হার কমানো, দেশে আরও ইপিজেড স্থাপন, পোশাক শিল্পের জন্য ৫ থেকে ৭ হাজার কোটি টাকার ফাণ্ড সৃষ্টি এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেয়া দরকার (সূত্র ঃ দৈনিক যুগান্তর ১৩/০৮/২০০০)। তাহলেই মুক্ত বাজার অর্থনীতি বিশ্ববাজারের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারবে।

www.pathagar.com

বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী মুক্ত বাজার অর্থনীতির হুকুমদাতা

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোর সবচেয়ে বড় দুঃখ তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে বার বার হোচট খায়। শির উঁচু করে তারা দাঁড়াতে পারে না। এজন্য দোষ কার—গরিব দেশের মানুষগুলোর নাকি তাদের যারা পরিচালিত করে তাদের। বিশ্ব ব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর হুকুমে চলে গরীব দেশগুলো। তাদের পলিসি মেকার বিশ্ব মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যেমনি নাচায় তেমনি নাচে পুতুলের কি দোষ। বাংলাদেশ আজ পুতুলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নিজস্ব কোন দর্শন নেই। নেই কোন ভূমিকা। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি চিন্তা-চেতনা সবকিছুই বিশ্বব্যাংকের দেয়া ফরমূলা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। রাজনীতিতে পশ্চিমাদের ইঙ্গিতে সংসদীয় গণতন্ত্র—তথা গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার চালু করে সংসদকে অকার্যকর করে তোলা হয়েছে। কোরাম পুরো হয়না। সংসদে বিরোধীদল থাকে না। এরপর আসুন অর্থনীতির ক্ষেত্রে—বিশ্ব ব্যাংক ও তার মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী এমনই এক অর্থনীতি চালু করা হয়েছে যেখানে স্বদেশী পণ্য বাজারে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর নাম নাকি মুক্ত বাজার অর্থনীতি। বাজারে, ফুটপাতে, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সব খানেই বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর দেশের পণ্যে ঠাসা। চিন্তা-চেতনা আর দেশীয় ভাবদ্বারা এখন আর নেই বললেই চলে। বাবু কালচার শুরু হয়ে গেছে ডিসের বদৌলতে। পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, লালন সংগীত, এগুলো এখন স্বপ্নের সংগীতে রূপ নিয়েছে। কালে ভদ্রে এগুলো শোনা যায়। এখন শখ করে ক্যাসেট কিনে এনে কেউ এ গানগুলো শুনে। Back dated item-এ পরিণত হয়েছে স্বদেশী সংগীতসমূহ।

আগে রেডিও টিভিতে প্রতিদিনই সিডিউল অনুযায়ী এ সমস্ত সঙ্গীত প্রচার হতো। ডিসের আগমনবার্তা পেয়েই প্রভুদের বিশ্বস্ত এজেন্টরা মিডিয়া—থেকে এগুলো উৎখাত করেছে। নাচ গানের সঙ্গে শরীর দোলানো হবে না, সমস্ত শরীর কাপড়ে আবৃত থাকবে—এটা হতে পারে না। সাহেব আর বাবুদের মেয়েরা যেভাবে ডিসে নাচানাচি করে ওটাই দরকার এদেশে। শুরু হয়ে গেল তথ্য প্রযুক্তির অবাধ আদান-প্রদানের বদৌলতে উদ্দাম নৃত্য। তেমনি মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে শুরু হয়ে গেল অবাধ শুল্কমুক্ত পণ্য আমদানি—জিনিসও ভাল, মূল্যও কম। মানুষ কিনবেনা কেন। গালে হাত দিয়ে স্বদেশী কৃষক শ্রমিক বসে আছে, কোন কর্ম খালি নাই মাঠে-ঘাটে আর মিল কারখানায়। কারণ দেশীয় মিল— কারখানায় উৎপাদন নেই। দেশীপণ্য এখন বাজারে চলে না। প্রতিযোগিতায় দেশী পণ্য মার খাচ্ছে। কৃষকরাও চাষাবাদ ছেড়ে দিচ্ছে। অনেক সময় ফসল ফলাতে যে খরচ হয় তাও উঠে আসেনা। চাষাবাদ করেও লাভ নেই। দেশী পণ্যের

www.pathagar.com

চেয়ে সস্তা মূল্যে বিদেশী পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাই আজ কৃষকের মাঠ বিদেশী এনজিওদের খামারে রূপ নিয়েছে। এনজিও সাহেবদের উক্তি ফসল ফলানোর দরকার নেই—জমিগুলো আমাদের কাছে বিক্রি করে ফেল। ভাল মূল্য পাবে। এভাবে গরিব কৃষক পেটের দায়ে সস্তা দামে বাপ-দাদার জমি বিক্রি করে দিচ্ছে বিদেশী এনজিওদের কাছে। শিল্প কারখানাগুলো রুগ্নতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে শিল্পগুলো—মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারার কারণে। দেশী শিল্প পণ্যের চেয়ে বহুজাতিক কোম্পানির শিল্প পণ্য আজ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে। তাই ভোক্তারা বিদেশী পণ্যের দিকে ঝুঁকছে বেশি। বিশ্বব্যাংক এমনই এক টেবলেট আমাদের দিয়ে গেছে যার ফলে দেশী পণ্য আজ বাজারে অচল। দুঃখজনক যে আজ দেশের ভূমির মালিক, শিল্পের মালিক, মিডিয়ার মালিক ইহুদি ও খ্রিস্টান দেশের মানুষরা। আবহমানকাল থেকে আসা বাপ-দাদার ভিটেমাটির সম্পত্তি মালিক স্বদেশী মানুষরা নয় বিদেশী এনজিওরা। ওদের খুদ কুঁড়ো খেয়ে দয়ায় বেঁচে আছে এদেশের মানুষরা। আজ দেশের অবস্থা অনেকটা সেরকম।

জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনের অনুষ্ঠানে (৬.৯.২০০০ বুধবার) কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিডেল ক্যাস্ট্রো বলেছেন কয়েকটি ধনী দেশ গোটা বিশ্বটাকে লুটেপুটে খাচ্ছে। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি দাতাগোষ্ঠী ও বিশ্বব্যাংকের শত শত কোটি টাকা শোষণের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। সিয়াটলে ১৯৯৯ সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সম্মেলন বিক্ষোভের মুখে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৯৯ সনে বসন্তঋতুতে ওয়াসিংটনে আই এম এফ ও বিশ্ব ব্যাংকের বৈঠক স্থলের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। তাদের কার্যকলাপ যে বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে তারই প্রতিফলন ঘটে এ সমস্ত বিক্ষোভে।

নিজের শেকড় শক্ত না করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি (Free Trade Economy) চালু করা আর নিজের পায়ে কুড়োল মারা একই কথা। নিজেদের অর্থনীতির ভিত প্রথমে শক্ত করতে হবে। 'স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য' কথাটি শুধু রাজনৈতিক শ্লোগানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রয়োগ দেখাতে হবে। দেশপ্রেম, সচেতনতাবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, দেশ ও মাটির রাজনীতি কথাগুলো সস্তা বাহবা পাওয়ার লক্ষ্যে উচ্চারণ করা হচ্ছে যাকে বলা হয় ভোটের রাজনীতি। হৃদয়ের ভিতর থেকে কথাগুলো যদি বেরিয়ে আসতো তাহলে আমরা হোচিমিনের ভিয়েতনাম, মাহাথিরের মালয়েশিয়ার মতো দেশ, ৫৪০০০ বর্গমাইল এলাকা বেষ্টিত আমাদের এই দেশটিও গড়ে তুলতে পারতাম। বিশ্ব ব্যাংক ও দাতা গোষ্ঠীর প্রেসক্রিপশন "মুক্ত বাজার অর্থনীতি কে" আমরা তখন চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করতে পারতাম। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের সচেতনতাবোধ ও দেশ প্রেমের শেকড় আগের চেয়ে এখন অনেক শক্ত। ভারতীয়রা স্বদেশী পণ্য ছাড়া বাইরের দেশের কোন পণ্য কিনে না। এমন কি পড়াশুনার জন্য বাইরের কোন দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রী ভারতে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তাদের জন্যও ভারতীয় পণ্য ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। তারই একটি বাস্তব ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

বরিশালের এক ছেলে ভারতে কম্পিউটার সাইন্স নিয়ে পড়ছে সেখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার মুখ থেকে শোনা এই কাহিনীটি সে আমাকে বলেছিলো কোন এক সন্ধ্যায় চলার পথে। চট্টগ্রাম জেলার এক ছেলে তার সাথে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই

www.pathagar.com

হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। একদিন ছেলেটি দেশের বাড়ি থেকে আসার সময় সাথে নিয়ে এসেছিলো একটি পাকিস্তানের তৈরি আচার। চট্টগ্রাম নিউমার্কেট থেকে ওর বাবা-মা আসার সময় আচারটি কিনে দিয়েছিল। ছেলেটি জানত না এই আচারটি তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। ভারতীয় ছাত্ররা হোস্টেলের রুমে এসে জেনে ফেলেছিলো আচারটি পাকিস্তানের তৈরি। তারা তখন রাগান্বিত স্বরে একবাক্যে বলল পাকিস্তানের তৈরি আচার এখানে কেন? কোথা থেকে কেনা হয়েছে ? ছেলেটি বলল দেশ থেকে আসার সময় বাবা মা আমাকে এটা কিনে দিয়েছে। আচার আমার খুব পছন্দ। পাকিস্তানি আচার যে এখানে নিষিদ্ধ তা আমি জানতাম না। ফ্যাঁকাসে হয়ে যায় ছেলেটির চেহারা। সে এতোকিছু জিনিসটি নিয়ে যে হবে তা ভাবেনি। ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত এতোদূর গড়ালো যে শেষ পর্যন্ত হোস্টেলে পুলিশ ডাকা হলো। পুলিশ কর্মকর্তাসহ জেলার ডেপুটি কমিশনার পর্যন্ত আসলেন। পুলিশ অফিসার আচারটি সিজ করলো এবং ছেলেটিকে কড়াভাবে বলল ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ যেন করা না হয়। অর্থাৎ এখানে থাকতে হলে ভারতীয় জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত হতে হবে। বিদেশী কোন জিনিস এখানে ব্যবহার করা যাবে না। একবার ভেবে দেখুন নিজের দেশের ব্যাপারে তারা কতটুকু সচেতন। তারা প্রথমেই ঘুম থেকে উঠে চিন্তা করে দেশের স্বার্থের কথা। তারপর করে নিজের চিন্তা। দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু ঘটতে দেখলেই সবাই একই প্লাটফরমে এসে অবস্থান নেয়। সরকারি দল বিরোধীদল জাতীয় ইস্যুর ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই। তখন তারা সবাই এক থাকে। আসলে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এ রমক দেশের জন্যই শোভা পায়। দাতাগোষ্ঠীর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী তারা চলে না। তারা নিজস্ব চিন্তা চেতনা নিয়ে চলে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে ভারতীয় প্রোডাক্টের কোন ক্ষতি হবে না। মিল কারখানা সেখানে বন্ধ হবে না। সেখানকার শিল্পপণ্য নিজেদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বসে নেই— বরং বর্হিবিশ্বের বাজার ধরার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করছে। এভাবেই তারা বাংলাদেশের প্রায় ১৩ কোটি মানুষের বাজার নিজেদের দখলে নিয়ে আসতে পেরেছে। এখানে মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে ভারত নিজের মতো করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো কিন্তু বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার পূর্বে ভাবতে হবে, এটা চালু করার মতো যোগ্যতা আমরা রাখি কিনা। ভাবতে হবে নিজেদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সচেতন। যেমন দোকানে গিয়ে আমরা প্রথমে নিজের দেশের পণ্যের অনুসন্ধান করি কিনা। নাকি দোকানে প্রবেশ করেই কি বলি—ভাই ভারতীয় কলগেট (দাঁতের মাজন) আছে? মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু করার পূর্বে এইগুলো বিবেচনায় আনতে হবে। দেশপ্রেমিক মানুষের জন্যই বিষয়টি প্রযোজ্য ও গুরুত্বও বেশি কারণ তারা নিজের দেশের ভাল-মন্দটি ভাল ভাবেই বোঝে। তারা পশুর মতো শেখানো বুলি আওড়ায় না।

আবারও বলছি মুক্ত বাজার অর্থনীতির কোন সীমাবদ্ধ দেশ বা এলাকা নেই। তার দৃষ্টি ও বিচরণ গোটাবিশ্বময়। সুযোগ পেলে যে কোন দেশে সে ঢুকে পড়বে এবং প্রাথমিকভাবে বাজার নিজেদের অনুকূলে নেয়ার জন্য স্বল্পমূল্যে টেকসই জিনিস বাজারজাত করবে। পাশাপাশি একথাও ঠিক মুক্ত বাজার অর্থনীতি অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দিয়ে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে। এই প্রতিযোগিতায় স্বদেশী পণ্য ঘরে বাইরে সিনা টান করে টিকে থাকতে পারলেই মুক্ত বাজার অর্থনীতি দেশের জন্য সার্থকতা বয়ে আনবে।

www.pathagar.com

মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবাদে লবণ শিল্পে ধ্বস নেমেছে

পাট শিল্পের পর এবার লবণ শিল্পের সকল নিয়ন্ত্রণভার ভারতের হাতে তুলে দেয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র চলছে। বিষয়টি আওয়ামী মন্ত্রী সভায়ও আলোচিত হয়েছে যাতে এই শিল্পসংস্থাকে ভারতের হাতে অর্পণ করা যায়। দেশে লবণের কৃত্রিম ঘাটতি দেখিয়ে লবণের পারমিট খুলে ভারত থেকে লবণ আমদানির ব্যবস্থা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ভারতের অন্যতম লবণ ব্যবসায়ী মিস্টার ফতেপুরিয়া মে ২০০০ ঢাকায় এসে বিষয়টি চূড়ান্ত করে যান। একজন সরকারি দলীয় সংসদ সদস্য ও কয়েক জন ভারতপ্রেমী লবণ মিল মালিকও ভারতে যান আমদানির পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য।

উল্লেখ্য যে ২লক্ষ টন ক্রড লবণ আমদানি করার জন্য ঘোষণা চূড়ান্তভাবে আলোচনা হতে পারে মন্ত্রিপরিষদে। জুন-২০০০ এর শেষ সপ্তাহে এ নিয়ে পত্রিকায় একটি রিপোর্ট ছাপা হয়। অথচ অনুসন্ধান জরিপে দেখা যায় দেশে প্রকৃত পক্ষ্যে লবণের কোন ঘাটতি নেই। বর্তমানে কক্সবাজারে লবণের আরতে ৭০ টাকা মণ দরে ক্রুড লবন বিক্রি হচ্ছে যে লবণ আগে ১৩০ টাকা বিক্রি হতো। দেশে বর্তমানে আড়াই লক্ষ টন লবণ মজুত রয়েছে। কক্সবাজারে মাঠে বর্তমানে লাখ লাখ টন লবণ গর্তে পুঁতে রাখা হয়েছে। সরকারের ব্যাংকগুলোতে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা লবণের জন্য লগ্নি করা আছে। দেশে লবণ সংকটের কোন প্রশ্নই উঠে না। এরপরেও যদি ভারত থেকে পারমিটের মাধ্যমে লবণ আমদানি করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিবে এবং লবণ উৎপাদনে ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে। ফলে লাখ লাখ টন লবণ ভারত থেকে পাচার হয়ে আসবে এ দেশে। চোরাচালানের আরেকটি নেট ওয়ার্ক বেড়ে যাবে। ফলশ্রুতি হিসেবে সরকার প্রকৃত রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে।

১৯৭৪ সনেও লবণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর মানুষ লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। আট আনা সেরের লবণ সে সময় ৬০/৭০ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল। ঐ সময় লবণ কেলেংকারীর বিখ্যাত ব্যক্তিটি এখন সরকারি দলের প্রভাবশালী মন্ত্রী। কৃত্রিমভাবে লবণ সংকট তৈরি করে '৭৪-এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। উদ্দেশ্য অবৈধভাবে টাকা কামানো। সুতরাং সাধু সাবধান!

বাংলাদেশে লবণের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ৯ লাখ টন। এখনই মজুত আছে আড়াই লাখ টন। বিগত ৪ বছর ধরে বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগে মজুত লবণ নষ্ট হয়ে যায়। সেরকম কোন ঘটনা বিগত চার বছরে ঘটেনি। তাহলে সংকট কেন? দেশে লবণ ব্যবসায়ীরা বলেছেন যদি সত্যিকার অর্থে লবণের ঘাটতি

www.pathagar.com

থাকে তাহলে সরকার টিসিবির মাধ্যমে লবণ আমদানি করে লবণ ঘাটতি মোকাবেলা করতে পারে। লবণ ব্যবসায়ীদের অনেকের অভিমত বি.এন.পি. র আমলে টিসিবির মাধ্যমে লবণ আমদানি করায় কোন কেলেংকারী হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে ভারত থেকে লবণ আমদানি করে সেই লবণ ৫০০ থেকে ৭৫০ টন পর্যন্ত দলীয় ধনবান মিল মালিককে পারমিট দেয়ার পায়তারা চলছে। এক শ্রেণীর ভারতপ্রেমী ব্যবসায়ীরা অহেতুক ভারতীয় লবণ আমদানি করে কোটি কোটি টাকা আয় করে দেশীয় লবণ শিল্পকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ দেশে লবণের চাষ উচ্ছেদ এবং লবণ চাষীদের সর্বশান্ত করার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে তারা। দেশের অর্থনীতিবিদদের ধারণা যেভাবে পাট শিল্প ও বস্ত্র শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছে ঠিক একই কায়দায় লবণ শিল্পকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চলছে। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের স্বার্থে দেশের মঙ্গল চান না এমন কিছু লোক এর পিছনে সক্রিয় রয়েছে বলে জানা যায়। অর্থনীতির হৃদপিণ্ড—গ্যাস ও বিদ্যুৎ নিয়েও চলছে নানারকম ষড়যন্ত্র। গ্যাস রপ্তানি এবং বিদ্যুৎ আমদানির মাধ্যমে দরিদ্র বিমোচনের কথা বলা হচ্ছে। এক সময় পাট, চা, চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে মজুত গ্যাস রপ্তানি করে দেশের অভাব লাঘব করা হবে। একটু মিলিয়ে দেখলে কি দেখব আমরা, অর্থকরি ফসলগুলো থেকে যে পরিমাণ রপ্তানি আয়ের কথা বলা হতো তা এখন আর হচ্ছে না। মজুত গ্যাসের ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটনা ঘটতে পারে। সবকিছুতেই শুভংকরের ফাঁকি। সোজা কথা অভ্যন্তরীণ সম্পদ থেকে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা নয় বরং বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভর করে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে দেশের বাজেট তৈরি করতে হয় এবং দেশ পরিচালনা করতে হয়। প্রসঙ্গের আলোকে আরেকটি কথা না লিখলেও নয় সম্প্রতি প্রায় ৩০০ লবণ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী (যুগান্তর ৫ জুলাই ২০০০) সারা দেশের লবণ মিল মালিকরা তাদের ৩০০ লবণের মিল স্বেচ্ছায় বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কারণ চলতি মৌসুমে ঘাটতির কারণে, লবণের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে সরকার ও মিল মালিকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় লবণ মিল মালিকরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী দেশে আড়াই লাখ মেট্রিক টন লবণের ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে ৪০ হাজার লবণ চাষীরা সময় মত ঋণ পাচ্ছে না ফলে লবণ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লবণ ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হলো সরকার লবণ ব্যবসায়ীদের দাবি-দাওয়া গ্রাহ্য না করে একতরফাভাবে ভারত থেকে লবণ আমদানির কথা ভাবছে। তাদের মতে লবণ আমদানির উদ্যোক্তাদের সরাসরি লবণ আমদানির সুযোগ দেয়া হলে ক্রাস লবণের চেয়ে কম মূল্যে বোল্ডার লবণ আমদানি করা সম্ভব হবে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মিলে বোল্ডার লবণ ক্রাসে প্রক্রিয়াকরণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। টিসিবিতে এ ব্যবস্থা না থাকায় এ প্রতিষ্ঠান ভারতেই বোল্ডার থেকে ক্রাস করিয়ে চড়া মূল্যে লবণ আমদানি করছে যা লবণ শিল্পের অন্তরায়।

www.pathagar.com

বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে কিছু প্রশ্ন

বিশ্বব্যাংক দাতা সংস্থা নয়, এটা একটি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান। পাশ্চাত্যের পুঁজিপতি গোষ্ঠীর সঞ্চিত পুঁজি তৃতীয় বিশ্বে বিনিয়োগ করাই হলো এর মূল লক্ষ্য। এই সংস্থাটি তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে পুঁজিপতিদের টাকা পাহারা দেয়। তাদের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে বিশ্ব ব্যাংক নামক এই সংস্থাটি। বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশেই তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোর বাজেটের রূপরেখা প্রণোদিত হয়। গরিব দেশগুলোর নিজস্ব কোন ভূমিকা নেই। তৃতীয় বিশ্বের সরকার প্রধানগুলো বিভিন্ন কারণে দুর্বলচিত্তের অধিকারী হয়ে থাকে। তার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ রাজনৈতিক সমঝোতার অভাব, সারাবছরই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করে। ফলে দেশগুলো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সরকারগুলো তাই রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সবসময় বিদেশীদের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। এজন্য বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর অন্যায় আবদার চোখবুজে মেনে নেয়া ছাড়া গরিব দেশগুলোর সরকারের অন্য কোনো বিকল্প পথ খোলা থাকে না। এরই সুযোগে বিশ্বব্যাংক নামক সংস্থাটি মোড়লের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসে—যেমন রাষ্ট্রের আমদানি রফতানি নীতি কেমন হবে, আয়কর, ভ্যাট, শুল্ককর, গ্যাস, বিদ্যুতের মূল্য কি পরিমাণ বাড়াতে হবে—মুদ্রার অবমূল্যায়ন কি পরিমাণ করতে হবে তারই একটি নীতি নির্ধারণী রিপোর্ট পেশ করেন সরকারের কাছে। প্রতি বছর সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই বাজেট তৈরি করতে হয় তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোকে। বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশাবলির বাইরে বাজেটে কোন বিষয় সংযোজিত করলে তার ব্যাখ্যা দিতে হবে অন্যথায় দাতাগোষ্ঠীর সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে—এই মর্মে একটি হুশিয়ারি উচ্চারণ—রেড সিগন্যাল হিসেবে রাষ্ট্রের পলিসি মেকারদের কাছে আগেই পৌঁছে যায়। বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার কারণেই জিনিসের দাম প্রতি বছর হু হু করে বেড়ে যায়। তখন দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আজ বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভ হচ্ছে কারণ শোষিত হচ্ছে বিশ্বের দরিদ্র মানুষগুলো ধনী দেশগুলোর মুখপাত্র বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর সংস্থাগুলোর মাধ্যমে। ২৬.৯.২০০০ মঙ্গলবার চেকপ্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগে বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু হলে সেখানে বিশ্বায়ন বিরোধী বিক্ষোভ হয়। তারা পুঁজিপতি বিশ্বের শোষণের হাতিয়ারগুলোর বিলুপ্তি কামনা করেন। এই জন্য ছিল এই বিক্ষোভের আয়োজন।

মূলত বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠী বাজার অর্থনীতি চালুর মাধ্যমে দেশকে একটি অসম প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিয়েছে। শিল্প-পণ্য বাজার দখল করে নিয়েছে ভারত ও সার্কভুক্ত

www.pathagar.com

অন্যান্য দেশ। আমাদের শিল্প-কারখানা ধ্বংসের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক তাদের গোপন মিশন বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। গোটা দেশ বিশ্বায়নের নামে এনজিওর মাধ্যমে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার করে গরিব মানুষগুলোকে ধর্মান্তরিত করাই তাদের মূল টার্গেট। কৃষি ও শিল্প পণ্যে যদি বাংলাদেশ উন্নতি লাভ করে তাহলে বিশ্বব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। সেইজন্য এই দুটি সেক্টরে অর্থ প্রদান থেকে বিরত থাকে যাতে বাংলাদেশ কোনক্রমেই এগিয়ে যেতে না পারে। দুঃখজনক যে আজ বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীর খয়রাতি সাহায্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। দেশের মানুষ গরিব থাকলেই খাদ্যাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা সহজ হবে। দেশ শিল্প ও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকলে এনজিওদের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে মূলত খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। পৃথিবীতে এ ধরনের অনেক নজির রয়েছে, যেমন ইথ্যুপিয়া, হাইতি, ক্যামেরুন, সুদান এবং বাংলাদেশে জাতিগত সংঘাত ও দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যাস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে ছুটে এসেছিলো পশ্চিমা এনজিওগুলো এক হাতে সাহায্য অন্য হাতে বাইবেল নিয়ে। আমাদের দেশে ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সনে এ ধরনের দৃশ্য আমরা স্বচোখে দেখেছি। দুঃখজনক যে আমাদের চেতনাশক্তিকে ভোগবাদীর মাধ্যমে অবচেতন করে রেখে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের কার্যসিদ্ধি করে নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ তাদের পণ্য গোটা দুনিয়ায় বাজারজাত করছে, অথচ নিজের দেশে স্বদেশী শিল্প পণ্যের বাজার নষ্ট করে বিদেশী পণ্য আমদানি করার অনুমতি দেয়া হয় না। একটি উদাহরণ আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানীর গাড়ির ব্যবসা নষ্ট করে আমেরিকায় জাপানের টয়োটা, করলা গাড়ি অবাধে আমদানি করার অনুমতি কখনো দেয়া হয় না। দেশীয় শিল্পের প্রটেকশনের স্বার্থে সেসমস্ত দেশে অনেক নিয়ম-কানুন চালু রয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এই নিয়মকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির মোড়কে আবদ্ধ করে বানচাল করে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। তাদের বক্তব্য অনেকটা এ রকম বাজার অর্থনীতির সুফল ভোগ করবে পুঁজিপতি বিশ্ব, তৃতীয় বিশ্ব শুধু Buyer এর ভূমিকায় থাকবে। বিশ্ব ব্যাংকের ভাষায় এই ফর্মূলার নামই হলো ম্যাক্রো অর্থনীতি। জাপানের কোন কোম্পানি যদি গ্রেট ব্রিটেনে শিল্প স্থাপন করতে চায় তাহলে ব্রিটেন অনুমতি দিবে দু'টি শর্তে—প্রথমটি হলো ব্রিটেনের যে অঞ্চলে বেকার সমস্যা প্রকট সেখানে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করতে হবে। সেই এলাকার লোকও নিয়োগ করতে হবে। পণ্য বাজারজাতও ব্রিটেনের বাণিজ্য নীতির আলোকে করতে হবে। আমাদের দেশে এ ধরনের চিন্তা কল্পনা করা যায় না। অবাক হতে হয় উন্নত বিশ্বে শিল্প কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের তৎপরতা সীমাবদ্ধতা রয়েছে কিন্তু বিশ্ব ব্যাংক গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এই অশুভ কাজটি চালু করার হুকুম জারি করে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলোতে যাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়, দেশ আরও অনগ্রসরতার দিকে অগ্রসর হয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে ইপিজেড-এ ট্রেড ইউনিয়ন চালুর প্রশ্নে মার্কিন নীতি ঠিক নয়, কথাটি বলেছেন জাপানি রাষ্ট্র দূত সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকার আলোচনায় (সূত্র ঃ প্রথম আলো ৩১/০৭/২০০০)।

www.pathagar.com

মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে তাহলে কি বিদেশী পণ্যের জন্য স্থানীয় বাজার খুলে দেয়া হবে। সেই প্রতিযোগিতার বাজারে বাংলাদেশের পণ্য টিকে থাকবে কিনা সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে। খোলা বাজার নীতি আজ পক্ষপাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে? আমরা যে পরিমাণ পণ্য অফিসিয়ালভাবে আমদানি করবো ঠিক সমপরিমাণ পণ্য সেই দেশ আমাদের থেকে আমদানি করতে হবে এটাই নিয়ম। বাণিজ্যে সমতা না থাকলে এক দেশ উন্নত হবে অন্য দেশটি অতলে ডুবে যাবে। একটি দেশের কারণে আরেকটি দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে সংকট সৃষ্টি হবে এটা বিশ্বায়ন বাণিজ্য নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। এ ধরনের বাণিজ্য নীতিতে মূলত প্রভু আর ভৃত্য সম্পর্ক তৈরি করবে। বাজার অর্থনীতি হতে হবে Friends not Master এই মনোবৃত্তির আলোকে। দুঃখজনক যে ভারত থেকে প্রতিবছর ১০০ কোটি ডলার পণ্যসামগ্রী অফিসিয়ালি আমদানি করে বাংলাদেশ অন্য দিকে ভারত মাত্র ৬ কোটি ডলার পণ্যসমগ্রী বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে এর নাম কি করে মুক্ত বাজার অর্থনীতি হয় বুঝে আসে না। এই নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে পাল্টাতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ও দাতাগোষ্ঠীরা যে মুক্ত বাজারের কথা বলছে সেখানে বাণিজ্যে সমতা নেই উল্টো বাণিজ্য প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে—দুর্বল শাসক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশের উপর। জনশক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা কর্মদোষে ও ভুল নীতির কারণে আজ গরিব। আর এই সুযোগটি পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের আরও দুর্বল করে দিয়ে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করছে। দু'টো দেশ সমভাবে শক্তিশালী হলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হয়। বাঘের সাথে শৃগালের প্রতিযোগিতা যেমন বেমানান—তেমনি ভারতের সাথে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে না। কারণ ভারতের উৎপাদন বেশি, শ্রমিক অসন্তোষ নেই, রাজনৈতিক অস্থিরতা নেই। দেশপ্রেমের ঘাটতি নেই। সেই জন্য উৎপাদন খরচ কম, শিল্পে প্রবৃদ্ধি বেশি। এই কারণে গুণগত মানসম্পন্ন জিনিস তারা স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে পারে, বাংলাদেশের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। বাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশ সুফল পেতে হলে জাতির রুট লেবেল থেকে বাংলাদেশকে চিন্তা করতে হবে। সহিংস রাজনীতি পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক অঙ্গনে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে হবে। অতিমাত্রায় ট্রেড ইউনিয়নের খবরদারী বন্ধ করতে হবে শিল্প প্রতিষ্ঠানে। অধিক উৎপাদনমুখী রাজনীতি চালু করতে হবে সর্বস্তরে। হরতাল নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। জাতীয় ইস্যু নিয়ে ঐক্যমতে আসতে হবে। তাহলে স্বল্প মূল্যে টেকসই মাল আমরাও সরবরাহ করতে পারবো। বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় আমাদের পণ্য যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে। বাজার অর্থনীতি তথা ম্যাক্রো অর্থনীতির স্ট্রাবিলিটির সুফলতা আমরা ভোগ করতে পারবো।

www.pathagar.com

মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রভাব ঃ বাংলাদেশের মুদ্রণ শিল্প এখন ভারতের দখলে

বাংলাদেশের বিগত কয়েকটি বাজেটে রুগ্ন শিল্পসমূহকে বাঁচানোর কোন নিশ্চয়তা বিধান রাখা হয়নি অথচ এমনভাবে মুক্ত বাজার স্টাইলে বাজেট তৈরি করা হয়েছে যার ফলে শিল্পবাজার এখন পুরো ভারতের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। অনেকটা এরকম ভারত দিলে আমরা খাবো, না হয় উপোস থাকবো। ভারতের দয়া-দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছে এদেশের মানুষ। এক সময় আমরা কিন্তু এ কথা বলিনি, বরং বলেছি আমাদের টাকায় পাকিস্তানের করাচি, লাহোর, ইসলামাবাদ শহর গড়ে তোলা হয়েছে। যারা তখন এ কথাগুলো বলেছিলো তারা এখন ক্ষমতায়। কিন্তু তারাই আজ বলছে ভারত ছাড়া কোন উপায় নেই। তারা অতীতের মতো আজ আর বলছে না বাংলাদেশের টাকায় পিণ্ডি আর লাহোরের মতো মুম্বাই, মাদ্রাজ কলকাতাকে শিল্পনগরী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু কেন বলছেনা সেই প্রসঙ্গে আমি যাবনা। তাহলে লেখা দীর্ঘ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গের আলোকে যে কথাটি বলবো—তা হলো বর্তমানে ছোট বড় প্রায় ১২ হাজার মুদ্রণ শিল্প এখন ধ্বংসের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। ২০০০—২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে মুদ্রণ শিল্পকে পুরোমাত্রায় ভারত নির্ভর করে গড়ে তোলা হচ্ছে।

ঘোষিত বাজেটে দুইটি এইচএসকোড-এর মুদ্রিত বই, ব্রুশিয়ার লিফলেট, একই ধরনের মুদ্রিত সামগ্রী কেবলমাত্র ৫% ভাগ শুল্ক দিয়ে আমদানি করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গত বাজেটেও উল্লেখিত উভয় এইচ এস কোড-এ যথাক্রমে ১৫% ও ৫% আমদানি শুল্ক ও উভয় কোডে ১৫% ভ্যাট আরোপিত ছিল। সেক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমদানি আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে দেশে মুদ্রণযোগ্য কোটি কোটি টাকার মুদ্রণ কাজ ভারতে চলে গেছে। বর্তমান ব্যবস্থায় এই পাচার আরও দ্বিগুণ হয়ে যাবে বলে অর্থনীতিবিদদের ধারণা।

এমনিতেই দিন দিন বাংলাদেশের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেনা। তদুপরি তাদের ৫৮·৫% শুল্ক ও ভ্যাট প্রদান করতে হয়। মুদ্রণের অন্যতম কাঁচামাল কাগজ। বাংলাদেশে কাগজের চাহিদা ১ লাখ ৭০ হাজার মেট্রিক টন, যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে পাওয়া যায় ৬০ হাজার মেঃ টন মাত্র। বাকি ১ লাখ ১০ হাজার মেঃ টন কাগজ আমদানি করতে হয় উচ্চ শুল্ক হার দিয়ে।

ভারতের মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা বিগত কয়েক বছর ধরেই ঢাকায় ঝাঁকিয়ে বসেছে এই ব্যবসায়। বর্তমান বাজেট তাদের ব্যবসা আরও বাড়িয়ে দেবে এবং ক্ষতি করবে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের খেটে খাওয়া মানুষের মুদ্রণ শিল্পকে। শুল্ক বৈষম্যের কারণে দেশের অনেক বড় বড় মুদ্রণ কাজ ভারতে চলে গেছে। বাংলাদেশ সরকার শুল্ক কমিয়ে দিয়ে, মণ্ড আমদানির শুল্ক কম করে বিদেশী মুদ্রণ ব্যবসার পথ খুলে দিয়েছেন। যেসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ৫% শুল্ক আরোপ করে ভারতের বাজার দখলের সুযোগ করে দিয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে খোদ ভারত বিদেশী বই আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপ করে রেখেছে—২৫% ভাগ।

মুদ্রণ ব্যবসার সাথে জড়িত এমনসব ব্যবসায়ীরা কাগজ ও মুদ্রিত কাগজের শুল্কের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে দেশে মুদ্রণযোগ্য সামগ্রিকে কেন বিদেশে ঠেলে দেয়া হবে? এতো বড় বিপর্যয় নিয়ে সরকার কেন ভাববে না, সেটাই প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। বাজেট উল্লেখিত উভয় এইচ এস কোড-এর ক্ষেত্রে ৫% শুল্কের স্থলে ২৫% শুল্ক ও ভ্যাট আরোপের দাবি জানিয়ে মুদ্রণ ব্যবসায়ীরা বলেন অন্যথায় নিজেদের অস্তিত্ব ও শিল্পের ভবিষ্যৎ রক্ষার আন্দোলনে নামতে হবে।

দুঃখজনক যে আজ মুক্ত বাজারের দোহাই দিয়ে ভারতের আনন্দবাজার প্রকাশনা গ্রুপকে এদেশে জামাই আদরে ব্যবসা করার সাদর আমন্ত্রণ জানানো হলো। ১৯৯৪ সনে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত জাতীয় গ্রন্থনীতির কোথাও বিদেশ থেকে প্রকাশনার আমদানির উল্লেখ নেই। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবাদে আনন্দ প্রকাশনা এদেশে ঢুকতে চাইছে।

যেখানে আমাদের দেশের বই ভারতে ঢুকতে দেয়ার ব্যাপারে গড়িমসি সৃষ্টি করে সেখানে তাদের বই পুস্তকই নয়, তাদের প্রকাশককেও সাদরে বরণ করে নেয়া হলো এদেশে। সম্প্রতি একটি সেমিনারে যেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম—উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী দুঃখ করে বলেছিলেন কলকাতার বইয়ের বাজার কলেজ স্ট্রিটে কোন দোকানে বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখকদের কোন বই খুঁজে পাওয়া যায়নি অথচ বাংলাদেশের বই বাজার বাংলা বাজারের প্রতিটি দোকানে ভারতের স্বনামধন্য লেখক থেকে শুরু করে ছোটখাট লেখকদের বই হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এমন কি ফুটপাতের দোকানগুলোতেও ভারতের বইয়ে ঠাসা। এমনি এক অবস্থায় হয়তো খুব দ্রুতই আমরা আমাদের লেখকদের নাম ভুলে যাবো যেমন ভুলে গেছি—দেশের ফিল্ম স্টারদের নাম। একটি বাচ্চা ছেলেও যত না জানে বাংলাদেশের শিল্পীদের নাম তার চেয়ে বেশি জানে ভারতীয় শিল্পীদের নাম। এ রকম একটি দেশে মুক্ত বাজার অর্থনীতি কিভাবে কার্যকরী হবে সেটাই ভাববার বিষয়। দেশীয় শিল্পের প্রোটেকশন না থাকলে দেশ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। আমাদের প্রকাশনা শিল্প সবেমাত্র কৈশর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করলো ঠিক তখনই মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবাদে ভারতীয় বই পুস্তক স্থানীয় বাজারে এসে সয়লাভ হয়ে গেলো। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের প্রকাশকরা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করে স্বল্পমূল্যে বই ছাপাতে পারে—আমাদের প্রকাশকরা তা পারে না। কারণ আমাদের এখানে ভারতের তুলনায় যাবতীয় জিনিসের দাম বেশি। তাই খরচও মাত্রাতিরিক্ত। ভারত যে দামে জিনিস বিক্রি করতে পারে আমরা তা পারিনা সমস্যাটা এখানেই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। দেশীয় ভোক্তারা যেখানে কমমূল্যে জিনিস পাবে সেখানেই যাবে। তারপরও কথা থেকে যায় আমাদের বুদ্ধিজীবীদের, লেখকদের

www.pathagar.com

পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে। তারা আনন্দ প্রকাশনা সংস্থাকে যেভাবে এদেশে এসে ব্যবসা করতে সাহায্য করছে, সেভাবে আমাদের দেশীয় নামকরা প্রকাশকদের ভারতে প্রকাশনা সংস্থা খুলতে সাহায্য তদবির করছে না। এই কাজটি যদি করতে পারতো তাহলে মুক্ত বাজার অর্থনীতি এই কথাটি কার্যকরী রূপ ধারণ করতো। আদান প্রদান, লেনদেন সমান সমান হলেই মুক্ত বাজার অর্থনীতি অর্থবহ হয়।

বেশি দূরে যেতে হবেনা পল্টন এলাকার বায়তুল মোকার্‌রম (উত্তরপার্শ্ব) সংলগ্ন এলাকার রাস্তার দুইধারে একদিন হাটলেই বুঝা যাবে—মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে কারা টিকে রয়েছে। দেশটি বাংলাদেশ কিন্তু রাস্তাঘাটে হাটলে মনে হয় আমরা ভারতের কোন সড়ক পথ দিয়ে হাঁটছি। ভিডিও, পোস্টার, সিডি ক্যাসেট, ভিউকার্ড এবং ভারতীয় বইয়ের সর্বশেষ এডিশন—ভারতে বাজার পাওয়ার আগেই বাংলাদেশে তার বাজারজাত প্রথমে হয়ে যায়। হুমায়ুন আহমদের চেয়ে সুনীল বাবুর বই এখন বাজারে বেশি পাওয়া যায় এবং তা খুব কম মূল্যে।

আজ দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে পশ্চিমবাংলার আনন্দ বাজার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশের বাজারে বই প্রকাশ করতে আসছে। উক্ত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের এদেশীয় এজেন্টরা বলছে আনন্দবাজার শুধু বাংলাদেশের লেখকদের বই সুলভমূল্যে বিক্রি করবে। সুতরাং কাজটি ভাল। বাংলাদেশের প্রকাশকদের পক্ষে সুলভ মূল্যে বই ছেপে পাঠকদের সামনে হাজির করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া এই শিল্পকে রাষ্ট্রীয় ভাবেও স্বীকার করে নেয়া হয়নি, দুঃখজনক যে দেশীয় প্রকাশকরা বই প্রকাশের জন্য ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত। বাঁধাইয়ের উপকরণসমূহ দুর্মূল্য ও দুর্লভ। এ সমস্ত কারণে বাংলাদেশী প্রকাশকরা কলকাতার তুলনায় বইয়ের অধিক মূল্য নির্ধারণ করতে বাধ্য থাকেন। বাংলাদেশের সরকার ও প্রকাশকরা গ্রন্থ শিল্পকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি না দেয়ার কারণে এই শিল্পকে মর্যাদার আসনে বসানোর জন্যই আনন্দবাজার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এদেশে আসতে চান। তারা স্বউদ্যোগে এদেশীয় লেখকদের বই সস্তায় ছেপে বিক্রি করে দিবেন। এতে অনেক লেখকের জন্ম হবে। প্রজন্মের মধ্যে লুকায়িত প্রতিভার উন্মেষ ঘটবে। স্বীয় স্বার্থে এই লোভনীয় টোপটি ছুড়ে দেন আনন্দ বাজার প্রকাশনা সংস্থা ও তার এদেশীয় এজেন্টরা।

বাংলাদেশের লেখকরা বেশির ভাগই দরিদ্র। অর্থের প্রয়োজনে অনেকেই আনন্দবাজারের কাছে ধরণা দিতে বাধ্য হবেন। এর ফলে এই শিল্পে বিনিয়োগকৃত প্রায় ১২ শ কোটি টাকার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে, তেমনি এই শিল্পের সাথে জড়িত প্রায় দেড়লাখ পরিবারের ওপরও নেমে আসবে দুঃসহ বেকারত্বের অভিশাপ।

উল্লেখ্য যে ফারাক্কার ফিডার ক্যানেল শেখ মুজিবের অনুমতি নিয়ে ৪১ দিনের জন্য চালু করা হয়েছিল। বিগত ৩০ বছর থেকে শুরু করে আগামী ৩০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা হয়। এ বিষয়টি অতীতের মতো বর্তমান ও ভবিষ্যতেও এর কোন সুরাহা হবে না। বরঞ্চ তারা পানি চুক্তির নামে এখনই বন্দর, ট্রানজিট, গ্যাস ইত্যাদি দাবি করতে শুরু করেছে। কোনরকম যদি আনন্দবাজার এখানে খুঁটি গেড়ে একবার বসতে পারে, তাহলে বাবু কালচারের ভিত ওরা প্রতিষ্ঠা করেই ছাড়বে।

www.pathagar.com

আনন্দবাজার প্রকাশনা সংস্থা যে একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান তার একটি নমুনা পশ্চিমবাংলার বামপন্থী কবি, সম্পাদক ও বুদ্ধিজীবী প্রয়াত সমর সেন—তার "বাবু বৃত্তান্ত" গ্রন্থে আনন্দ বাজারের একাধিক সাম্প্রদায়িক কর্মের নমুনা উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তারই একটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি—১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনের সময় আনন্দ বাজার পত্রিকা একটি লিড নিউজ ছাপে এভাবে—বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ থেকে পাঠানো ইলিশের পেটিতে হিন্দু মহিলার কর্তিত মস্তক পাওয়া গেছে। এই সংবাদ প্রকাশের সাথে সাথে কলকাতায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। এই পত্রিকা সম্প্রতি তসলিমা নাসরিনকে পুঁজি করে বিগত ১০ বছরে ১০ কোটি টাকা আয় করে নিয়েছে। অন্যদিকে তার রচিত বই প্রকাশ করে বাংলাদেশকে একটি অসভ্য দেশ হিসেবে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করছেন, বিনিময়ে তসলিমাকে কিছু নজরানা স্বরূপ পুরস্কার দিয়েছেন বটে কিন্তু আয় করে নিয়েছেন বিরাট অংক এবং পাশাপাশি বাংলাদেশের ভাব মূর্তিকে বিনষ্ট করেছেন। আনন্দবাজার গোষ্ঠীর এই কূট কৌশলকে নীরবে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশেরই কয়েকটি নামকরা পত্রিকা। এভাবেই বাংলাদেশে সুকৌশলে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি তথা সাম্প্রদায়িক চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্র তৈরির প্রচেষ্টায় তারা নিয়োজিত রয়েছেন। সুতরাং বলতে দ্বিধা নেই, মুক্ত বাজারের নামে আমরা পাচ্ছি রুগ্ন শিল্প, বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং একটি দুর্বল অর্থনীতির রাষ্ট্রীয়-কাঠামো ও বেকারত্বের অভিশাপ।

www.pathagar.com

অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় মুক্ত বাজার অর্থনীতির অন্তরায়

অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চরমভাবে মার খাবে। শিল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে—উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। রুগ্ন শিল্পগুলোকে মেরামত করে সুস্থ করতে হবে যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা মুখে বলবো কিন্তু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি না করে খালি ময়দানে বিদেশীদের গোল দেয়ার সুযোগ করে দিবো—এটা মেনে নেয়া যায় না। দুঃখজনক যে বাংলাদেশে আজ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যক্তি খাতে, সমষ্টিখাতে বিনিয়োগ খুবই কম। যেমন সুপার মার্কেট, বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও আবাসিক ভবন এবং দলীয় অফিস ও তাদের নেতাদের রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যেভাবে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সেই তুলনায় উৎপাদনশীল খাত শিল্পে বাণিজ্যে বিনিয়োগ খুব শ্লথ গতিতে হচ্ছে। আজ জাপান ও কোরিয়ায় ঘরে ঘরে শিল্প ইউনিট নির্মাণ হচ্ছে, কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যেও। একটু খোলা জায়গা পেলেই তারা সেখানে নিত্যনতুন প্রযুক্তি স্থাপন ও শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণে এগিয়ে আসছে। অনেক জাপানি ও কোরিয়ানরা রাত্রি যাপন করে শিল্প কারখানায়। মুলত শিল্প কারখানাকেই তারা ঘরবাড়ি বলে মনে করে। জাপান, দঃ কোরিয়া, তাইওয়ানের প্রতিটি বাড়িই যেনো এক একটি যন্ত্রচালিত উৎপাদন কেন্দ্র। লেটেস্ট প্রযুক্তি দ্বারা সাজানো হয়েছে বেড রুম কাম অফিস রুম। শিল্পপণ্য বাজারজাত করতে হলে পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদেরও সেভাবে চিন্তা করতে হবে। আমরা যদি শুধু ক্রেতা বা ভোক্তার ভূমিকা নিয়ে চিন্তা করি—তাহলে আমরা সারাজীবন ক্রেতার ভূমিকায় থেকে যাব, নির্মাণ, প্রডিউসার, কারিগর, মালিক, বৈজ্ঞানিক এ সমস্ত বহুমুখি বিশেষণে আমরা বিশেষিত হতে পারবো না। ব্যক্তি-খাতে বিনিয়োগে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি বাড়বেনা। বেকার সমস্যা লাঘব হবে না। উদাহরণস্বরূপ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিম্নতম দুইশত থেকে দুই হাজার লোকের কর্মসংস্থান করা যায়। উৎপাদন হয় লাখ লাখ টন পণ্যসামগ্রী। সেই পণ্য বাজারজাত করে কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় যদি পণ্যটি আন্তর্জাতিক বাজার পাওয়ার মতো মানসম্পন্ন পণ্য হয়। এতে জি. এন. পি. র (G.N.P.) প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধি পাবে এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় আমরা টিকে যাব এবং শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ সম্ভব হবে। ব্যক্তি-খাতে বিনিয়োগে এটা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগে ব্যক্তি বা একটি পরিবারের সদস্যদের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব—একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।

বিশ্বব্যাপী ইনফরমেশন টেকনোলজির অগ্রযাত্রা এবং বর্তমান আধুনিক বিশ্বে কম্পিউটার বিজ্ঞানের অবাধ ব্যবহার দিনকে দিন বাড়ছে। তথ্য প্রযুক্তি বিশ্বের অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

চেহারা বদলে দিচ্ছে। উৎপাদন, ভোগ, বাজারজাত থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়ছে। একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য হবে প্রযুক্তিভিত্তিক। এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে। কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য নতুন রূপ দিতে পারি। এখান থেকেও সফটওয়্যার রপ্তানি সম্ভব। সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেছেন—বিদেশী সাহায্যের ওপর উন্নয়ন বাজেটের ৭৬ ভাগ নির্ভরশীল। প্রতিবছর আভ্যন্তরীণ সম্পদ আরোহণের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্যের এই হার কমিয়ে আনতে পারি। উন্নয়ন বাজেটের ৭৫% টাকা আমরা এখান থেকেই সংগ্রহ করতে পারি।

দেশ স্বাধীনের পর আমরা দু'টি খাতে বেশি পুঁজি বিনিয়োগ করেছি। এর একটি হলো আবাসন সঙ্কট নিরসণের নামে হাউজিং ব্যবসায় এবং দ্বিতীয়টি হলো—নামে বেনামে জমি ক্রয় করে আবাদি জমির পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছি। এই দুই খাতে বিনিয়োগের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে গেছে। চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাওয়ার অর্থ হলো জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া। সুতরাং এই খাতগুলোকে আমরা অনুৎপাদনশীল খাত বলে চিহ্নিত করবো। প্রকৃত অর্থে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তই বেশি। বিত্তবানদের সংখ্যা খুবই কম—অথচ এই কম সংখ্যক মানুষদের সুখের জন্য পুঁজির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। আবাসন সঙ্কটে যারা ভুগছেন—সেই মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের জন্য প্রকৃত অর্থে এখনো কিছু করা হয়নি। মহানগরীতে প্রায় ১৮ থেকে ২০ লক্ষ মানুষ এখনো ভাসমান অবস্থায় রয়েছে, যাদের দেশ গড়ার ও নগরীর উন্নয়ন কাজে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাদের শেষ আশ্রয়স্থল ছিলো বস্তি। সরকার নগরীর সৌন্দর্য রক্ষার স্বার্থে বস্তি উচ্ছেদ করেছেন কিন্তু ভাসমান মানুষগুলোর পুনরবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা যায় কাল টাকাকে সাদা করার জন্য ধনী শ্রেণীর মানুষগুলো আজ অনুৎপাদনশীল খাতে তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করছে—কারণ এই বিনিয়োগে কোন ঝুঁকি পোহাতে হয় না, ঋণ নেয়ার সুযোগ আছে, কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ রয়েছে, সলিড আয়ের ব্যবস্থা আছে এবং জবাবদিহিতারও প্রশ্ন উঠবে না।

আমি নগরীর কয়েকজন গৃহনির্মাণ কোম্পানির মালিকদের সাথে আলাপ করে বুঝলাম গৃহনির্মাণ ও শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণে পুঁজি বিনিয়োগ করলে সেই পুঁজি লাভ সমেত তুলে নেয়া সম্ভব কিন্তু শিল্প কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগে প্রচণ্ড ঝুঁকি পোহাতে হয়। শিল্পে ট্রেড ইউনিয়নের অশুভ তৎপরতা ও কর্মকর্তাদের লাগামহীন অসাধুতা ছাড়াও পণ্য বাজারজাত করা এবং বাজারে টিকে থাকা ভীষণ কষ্টকর। মূলত বিনিয়োগ উদ্যোক্তারা বর্তমানে এই সঙ্কটে তীব্রভাবে ভুগছেন। সরকারের মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে স্বদেশী শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন কঠোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি—ফলে বিদেশি পণ্য অবাধে বাজার দখল করে নেয়ার সুযোগ পাচ্ছে। মূলত আমরাই সেই সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছি। আজ জাপানকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে আমাদের এগুতে হবে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাপান শিল্পোন্নয়নে যে পথ দেখিয়েছে বাংলাদেশকেও সেই পথ অনুসরণ করতে হবে। প্রযুক্তি ও দক্ষতা না থাকলে মুক্ত বাজারে টিকে থাকা অসম্ভব। বনের পশুরা যেমন গায়ের জোরে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা করে তেমনি মানুষ প্রতিযোগিতা করে প্রযুক্তি ও দক্ষতার জোরে। রাশিয়া মুক্ত বাজারে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়েছে দক্ষতা ও প্রযুক্তির কাঠামোগত ব্যবহারের অভাবে। পশ্চিম বাঙলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু বিষয়টি বুঝতে পেরে বলেছেন, ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে যন্ত্রপাতি এনে উন্নত প্রযুক্তি রপ্ত করতে হবে। জাপান সেই প্রযুক্তি রপ্ত করতে পেরেছে বলেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ সকল ধনতান্ত্রিক দেশের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। অনেকেই বলতে পারেন, নতুন প্রযুক্তি মানে শ্রমিক ছাটাই, এটা ভুল ধারণা। উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ না করলে—শিল্পের খাতগুলি—রুগ্ন, অদক্ষ ও অলাভজনক অবস্থায় পড়ে থাকবে। শুধু বেতন দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের কত বছর পোষা যাবে—যদি প্রতিষ্ঠানটি লাভের মুখ না দেখে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির মূল দর্শনে আমাদের ঢুকতে হবে। অর্থাৎ শ্রমিক ছাটাই বা কর্মসংস্থানের ক্ষতিসাধন নয়, আবার অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে যেন রূপ না নেয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। রুগ্ন ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগ লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যায় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে।

'জমি যার লাঙ্গল তার' এই শ্লোগান উঠছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে। জমি কিনে জমিদারী প্রথা এখন সেখানে অবলুপ্ত। ভূমিহীন মানুষ এখন জমির মালিক হয়েছেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সেখানে ভূমি সংস্কার চলছে। সবুজ বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হচ্ছে পশ্চিম বাংলাসহ আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা। মৎস্য খামার, দুগ্ধ খামার, পল্ট্রি ফার্ম স্থাপনসহ ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হচ্ছে—পতিত জমিতে। Grow more food—এই নীতি নিয়ে ভারত অগ্রসর হচ্ছে মুক্তবাজারে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার জন্য। বিশ্ব অর্থনীতি যেভাবে চলছে—সেই ম্যাকানিজমে আমাদের চলতে হবে।

Father of Economics—অর্থনীতির জনক অ্যাডম স্মিথের মতে, অর্থনীতি হচ্ছে সম্পদের বিজ্ঞান। অভাব অসীম তবে সম্পদ সসীম। অসীম অভাব ও সসীম সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মানুষের সর্বাধিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। সুতরাং অর্থনীতিকে একটি বিশেষ উন্নয়নমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে (A Development Process) কাজে লাগাতে হবে। এ্যাডাম স্মিথের অর্থনৈতিক সূত্র সেই কথাই বলেছে বার বার। জাতীয় সম্পদ বাড়াতে হলে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমিয়ে উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে তাহলেই একুশ শতকের মুক্ত বাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা সফল হবো।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ এবং সাহায্য মঞ্জুরীর ওপর ভিত্তি করেই আমরা প্রতি বছর বাজেট তৈরি করি এবং উন্নয়ন বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করি যার ফলে দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। এছাড়া রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের মধ্যেও রয়েছে বিরাট পার্থক্য তারই এক সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো—

www.pathagar.com

বাজেট বরাদ্দের সংক্ষিপ্তসার

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০০০-০১	সংশোধিত ১৯৯৯-২০০০	বাজেট ১৯৯৯-২০০০
প্রাপ্তি			
সংযুক্ত তহবিল -প্রাপ্তি			
প্রাপ্তি	২৩,৮০৪	২১,৩৫৪	২৩,৯২৭
সাহায্য মঞ্জুরী	৩,১৮৩	৩,৬০৯	৩,২৬৯
ঋণ ও অগ্রিম	৮৮০	৮৬২	১,০২২
অভ্যন্তরীণ ঋণ	৭,১১৩	৪,৭৪৮	৪,১২০
বৈদেশিক ঋণ	৬,২৩৮	৫,২২৩	৫,০৯১
আই এম এফ এর সাথে- সমন্বয়	২৭০	২৬০	২১০
	৪১,৪৮৮	৩৬,০৫৬	৩৭,৬৩৯
টি এন্ড টি বন্ড	২০০	১৭১	১৭১
ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ঋণ	৩৫১৪	৩৯৩৪	০
	৪৫,২০২	৪০,১৬১	৩৭,৮১০
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব -প্রাপ্তি			
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব	১০,৯৬২	১০,৫৮০	১২,২৪৪
	১০,৯৬২	১০,৫৮০	১২,২৪৪
মোট প্রাপ্তিঃ	৫৬,১৬৮	৫০,৭৪১	৫০,০৫৪
ব্যায়			
সংযুক্ত সহবিল ব্যয়			
অনুন্নয়ন	৩০,৫১৬	২৬,২২৯	২৫,০৫৬
উন্নয়ন	১৭,৮৩৩	১৭,০৫৬	১৫,৮২১
	৪৮,৩৪৯	৪৩,২৮৫	৪০,৮৭৭
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব-ব্যয়			
প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব	৭,৮১৫	৭,৪৫৬	৯,১৭৭
	৭,৮১৫	৭,৪৫৬	৯,১৭৭
মোট ব্যয়ঃ	৫৬,১৬৪	৫০,৭৪১	৫০,০৫৪

***

*** তথ্য সূত্রঃ বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি। (বাজেট বরাদ্দ ২০০০-২০০১) অর্থমন্ত্রণালয় —অর্থ বিভাগ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

www.pathagar.com

অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় ঃ দেশের অর্থনীতির বারটা বাজাচ্ছে

পুঁজি বিনিয়োগে যদি মুনাফা না আসে—তাহলে সেই বিনিয়োগে কোন অর্থ হয় না। অর্থ বিনিয়োগে যদি উৎপাদন না হয়—বেকার সমস্যার লাঘব না হয়, মূলধন সৃষ্টি না হয় তাহলে বুঝতে হবে—টাকাটা অপাত্রে ঢালা হয়েছে অর্থাৎ অনুৎপাদনশীল খাতে টাকাটা ব্যয় করা হয়েছে। অবশ্য কিছু কিছু বিনিয়োগ আছে যা মানব কল্যাণে ও সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে করতে হয়—যেমন হাসপাতাল, স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পের নানাবিধ ব্যয়। এ সমস্ত খাতে বিনিয়োগ জাতীয় স্বার্থে উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। অনেকটা (Non-Trading Concern) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের মতো। জাতীয় আয় তথা সংযুক্ত তহবিল প্রাপ্তি বৃদ্ধি করতে না পারলে উন্নয়ন খাতে ব্যয় বাড়ানো সম্ভব হয় না। আর এই জাতীয় আয় বৃদ্ধি সম্ভব, যখন পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করা হয়। অপ্রিয় হলেও সত্য যে বিগত বছরগুলোতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে তা কি লাভজনক প্রকল্প নাকি অলাভজনক/অনুৎপাদনশীল খাত ছিল তার একটি হিসাব নেয়া বা জানা আমাদের দরকার জাতীয় স্বার্থে। স্বাধীনের পর যে কয়জন অর্থমন্ত্রী অর্থ মন্ত্রণালয়ের গুরুদায়িত্বে ছিলেন তাদেরও এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে—এই মর্মে যে টাকাগুলি কিভাবে তারা ব্যয় করেছেন। আমাদের বিনিয়োগটা যথার্থস্থানে হয়েছে নাকি হয়নি তার প্রমাণ পেতে হলে বৈদেশিক মুদ্রায় আমাদের সঞ্চিত অর্থ প্রতি বছর বাড়ছে নাকি কমছে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর কতটা নির্ভরশীল আমাদের অর্থনীতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি নাকি উদ্বৃতি, রাষ্ট্রীয় শিল্পখাত লাভজনক নাকি লোকসান যাচ্ছে, মানুষের হাতে টাকা আছে কি নেই, এ সমস্ত অর্থনৈতিক ডাটা অবলোকন করলে আমাদের বিনিয়োগে, রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় দুর্দিন না সুদিন চলছে এ ব্যাপারে একটি সম্যক ধারণা জন্মাবে। ব্যবসা আছে কি নেই তারও একটা ধারণা পাব। এ ব্যাপারে দৈনিক জনকণ্ঠ ১/৮/২০০০ লিড নিউজে লিখেছে রাজধানীর ব্যবসায়িক এলাকা পূরাণ ঢাকায় দৈনিক লেনদেন হিসাবে প্রায় দেড়শ কোটি টাকা ব্যবসা কমেছে। পূর্বের চেয়ে শতকরা হিসাবে ৪২ ভাগ ব্যবসা কমেছে। এ জন্য ব্যবসায়ীরা চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন (১) চোরাচালান, (২) সন্ত্রাস, (৩) চাঁদাবাজী, (৪) লোডশেডিং।

অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে এখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কম—যার কারণে টাকার ১৭-তম অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে যাতে রিজার্ভ জোড়া তালি দিয়ে কোন রকম বৃদ্ধি করা যায় তারই একটা প্রচেষ্টা চালানো হয় অবমূল্যায়নের মাধ্যমে। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার আগে ৩২০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন ৪ বছরের শেষে এসে (১১সেপ্টেম্বর ২০০০ইং) দাঁড়িয়েছে ১৩৭ কোটি ২৫ লাখ ১০ হাজার মার্কিন

www.pathagar.com

ডলারে। আন্তর্জাতিকভাবে তিন মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর সমান টাকা না হলে—তাকে নিরাপদ মাত্রা হিসাবে ধরা হয় না। রিজার্ভে বর্তমান অংক আন্তর্জাতিকভাবে নিরাপদ মাত্রার নিচে রয়েছে। ১৫০ কোটি ডলারের নিচে নামলে তাকে বিপদসীমা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কিভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের গোটা অর্থনীতিকে আমরা ফোকলা করেছি তারও একটি হিসাব এখানে তুলে ধরবো।

যেখান থেকে ব্যবসায় টাকা সার্কুলেশন করা হয় সেই পুঁজি বিনিয়োগ বোর্ড (আইসিবি) কেমন চলছে তারও একটি হিসাব নেয়া দরকার। ব্যবসা ভাল হলে শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে—সেই হিসাবে আইসিবি তার ব্যবসার লভ্যাংশের দিকে তাকালে বুঝা যাবে—কেমন চলছে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা।

অর্থ বছর	শতকরা লভ্যাংশের হার
	(ইউনিট প্রতি)
১৯৮০-৮১	১৫.০০
১৯৮১-৮২	১৬.০০
১৯৮২-৮৩	১৬.২৫
১৯৮৩-৮৪	১৭.০০
১৯৮৪-৮৫	২০.০০
১৯৮৫-৮৬	২১.০০
১৯৮৬-৮৭	২৩.০০
১৯৮৭-৮৮	২৪.০০
১৯৮৮-৮৯	২৫.০০
১৯৮৯-৯০	২৫.০০
১৯৯০-৯১	১৮.০০
১৯৯১-৯২	১৬.৭০
১৯৯২-৯৩	১৭.০০
১৯৯৩-৯৪	১৭.৪০
১৯৯৪-৯৫	১৭.৫০
১৯৯৫-৯৬	১৭.০০
১৯৯৬-৯৭	১৭.৫০
১৯৯৭-৯৮	১৪.০০
১৯৯৮-৯৯	১২.০০
১৯৯৯-২০০০	১২.০০

উল্লেখিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আইসিবির লভ্যাংশের হার কমতে শুরু করে। এই হার কমার সাথে সাথে ইউনিট ফাণ্ড

www.pathagar.com

বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা সমানে তুলে নিচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০০০সন পর্যন্ত প্রায় ১০০ কোটি বিনিয়োগকৃত টাকা বিনিয়োগকারীরা তুলে নিয়েছে। আইসিবি অফিসে লাইন দিয়ে টাকা তোলার দৃশ্য প্রতিদিন দেখা যায়।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর শেয়ার বাজারেও বিপর্যয় ঘটে। বর্তমান অর্থমন্ত্রী তার পূর্বসূরি অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের শেয়ারের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের আমূল পরিবর্তন ঘটান। আর যায় কোথায়, শুরু হলো শেয়ার বিপর্যয়। বর্তমান অর্থমন্ত্রী অতীতের শেয়ার লকিং ব্যবস্থা তুলে দিয়ে শেয়ার বাজার চাঙ্গা করার নামে মূলত শেয়ার বাজার ধ্বংস করে দিয়েছিল। বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এক বছরের মধ্যে খরিদকৃত শেয়ার বিক্রির সুযোগ পেল শেয়ার লকিং পদ্ধতি তুলে দেয়ার কারণে। পূর্বে শেয়ার লকিং থাকার কারণে নিম্নতম এক বছর টাকা ধরে রাখতে হতো। এ ব্যবস্থা তুলে দেয়ার কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে মারোয়ারী আশোক মেহতা গ্রুপ ও হংকং-এর ফটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা ঢাকায় এসে স্থানীয় শেয়ার দালালদের মাধ্যমে শেয়ার খরিদ করে বাজারে শেয়ারের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। এদিকে দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ সচ্ছলতার প্রত্যাশায় জমি জমা, গরুবাছুর, ঘরবাড়ি বিক্রি করে শেয়ার ক্রয় করেছিল তারাও শেষ অব্দি ফতুর হয়ে গেল। কারণ বেনিয়ারা শেয়ারের মূল্য বাড়িয়ে হাতের শেয়ার বিক্রি করে হাজার হাজার মানুষকে পথে বসিয়ে তারা কোটি কোটি ডলার নিয়ে দেশত্যাগ করে। শেয়ার লকিং সিস্টেম চালু থাকলে কাজটি করতে তারা পারতনা।

পুঁজি বাজারের টাকা আসে সাধারণ মানুষের শেয়ার ক্রয় থেকে। বর্তমান সরকার শেয়ার কেলেঙ্কারির সাথে জড়িত যারা তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সাড়ে ছয় হাজার কোটি টাকা ৫০ জন লোকের কাছে পাওনা রয়েছে। দেওলিয়া আদালত ঐ টাকা এখনো আদায় করতে পারেনি। তারা দিব্যি আরামে ঘুরছে—প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হয়ে। শেয়ার কেলেঙ্কারীর নায়কদের খেলাপি ঋণের কারণে সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা আইএফআইসি ব্যাংকসহ অনেক প্রতিষ্ঠান থেকে বিগত কয়েক বছর যাবত শেয়ার লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত রয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ বুধবার সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বর্তমান অর্থমন্ত্রী এস এ এম এস কিবরিয়া স্বীকার করেছেন দেশের জনগণের মাথা পিছু ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৯০৯ টাকা ১৯ পয়সা। মাথাপিছু এই ঋণের টাকা প্রতিবছর সুদ সমেত পরিশোধ করতে হয়। ঋণ গ্রহণ করে ঋণের টাকা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়ের কারণে জাতির দৈন্যদশা চরমে পৌছেছে। বিদেশ থেকে পাওয়া ঋণ সাহায্য কিভাবে অনুদান সাহায্যের তুলনায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

বছর	অনুদান সাহায্য	ঋণ সাহায্য
৭১-৭৩	৮৯.০০ শতাংশ	১১.০০ শতাংশ
৭৮-৮০	৫১.২০ শতাংশ	৪৮.০৮শতাংশ
৯৬-৯৯	৪৪.০৭শতাংশ	৫৫.০৩শতাংশ

www.pathagar.com

উল্লেখিত চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে তুলনামূলকভাবে অনুদান সাহায্য কমেছে অন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে ঋণ সাহায্য।

বিগত চার বছরে রেকর্ড পরিমাণ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে কোন কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটছে না। মূলধন সৃষ্টি হচ্ছে না। অনেকেই বলছেন বর্তমানে হাউজিং ব্যবসায় যে টাকা খাটানো হচ্ছে তা শুধু ব্যক্তিকে উন্নতি করবে, রাষ্ট্রের কোন উপকারে আসবে না। কালো টাকাকে সাদা করার একটি পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে বহুতলবিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করে, আবাদি জমিগুলিকে অনাবাদী করে রাখা হচ্ছে। অন্যদিকে হাউজিং ব্যবসায় রফতানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করবে না। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়বেনা। বরং মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানোর সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সচেতন মানুষের অনেকেই এই মতামত প্রকাশ করেছে।

ইস্টার্ন হাউজিংসহ নগরীর কয়েকটি নামকরা হাউজিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি যে হারে জমি কিনছে তাতে ঢাকায় কিছুদিন পর জমি খুঁজে পাওয়া যাবে না সেবা বা উন্নয়নমূলক কোন প্রকল্প তৈরি করার জন্য। ঢাকায় জমির মূল্য তারাই বাড়িয়ে দিয়েছে। লণ্ডনের সমান হয়ে গেছে ঢাকার জমির মূল্য। সমস্যাটা প্রকট হয়ে দেখা দিত না—যদি প্রকল্পটি কোন শিল্প কারখানা হতো, হতো কোন উন্নয়নমূলক সেবা প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থ রোজগারের পথ থাকবে। পুঁজির সদ্ব্যবহার হবে। বেকার সমস্যার সমাধান ঘটবে। হতবাক হতে হয় যে, এ সমস্ত আবাসন প্রকল্পে নগরীর ভাসমান ১৮ লাখ লোকের মাথা গোঁজার কোন সুযোগ নেই—অথচ এরাই নগরির চালিকা শক্তি। এই লোকগুলি না থাকলে মুহূর্তের মধ্যে নগর জীবন স্তব্ধ হয়ে যাবে। কর্মহীন একটি নগরে পরিণত হবে ঢাকা শহর। দুঃখজনক যে বস্তি উচ্ছেদ করা হয় কিন্তু নগরীর কর্মঠ মানুষগুলোর থাকার ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারি ও বেসরকারিভাবে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত করা হয়নি। স্বাধীনের পর অসৎ উপায়ে রোজগার করে যারা কালো টাকার মালিক হয়েছেন তাদের পৃষ্ঠপোষক সবাই করছে। আর এভাবেই কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর আবাসিক প্রকল্পের নামে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হচ্ছে যার থেকে কোন রিটার্ন আসছে না। জাতীয় আয় বিহীন অপ্রয়োজনীয় কতগুলো অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যাপক অংকের অর্থ বরাদ্দের আরেকটি হিসাব নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়
১। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ। (৭ মার্চ ১৯৭১ সনে শেখ মুজিবুর রহমান এখান থেকে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন)	২৭৪ কোটি টাকা (দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সংবাদ অনুযায়ী)
২। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ	৭ কোটি টাকা।
৩। ফাইন ও পারফর্মিং আর্টের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (নাচ, গান, ঢোল বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির প্রশিক্ষণ)	২০ কোটি ৭ লাখ ৩৭ হাজার টাকা

www.pathagar.com

প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়
৪। জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ (১ম পর্ব)–	২২ কোটি ৬২ লাখ ৫৩ হাজার টাকা।
৫। জাতীয় নাট্যশালা নির্মাণ (১ম পর্ব)-	২১ কোটি ৫৩ লাখ ৬৯ হাজার টাকা।
৬। জেলা পর্যায়ে শিল্পকলা একাডেমি স্থাপন-	১১৭ কোটি ৭০ লাখ ৫২ হাজার টাকা
৭। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আধুনিক মিলনায়তনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ- (তথ্যসূত্র ১৯৯৮-৯৯ সনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পৃঃ ২৭৬)	৩৩ কোটি ২৫ লাখ ৪৬ হাজার টাকা।
৮। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিসৌধ নির্মাণ (মিরপুরে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ থাকার পরেও)-	১৮ কোটি টাকা।
৯। শিলাইদহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপন—	৪ কোটি ৯৯ লাখ ৭৫ হাজার টাকা।
১০। টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু মাজারে স্মৃতি সৌধ নির্মাণ	২ কোটি ৭৯ লাখ ১৮ হাজার টাকা।
১১। সুবিন্যস্ত লাইট এ্যাণ্ড সাউণ্ড প্রকল্প- (তথ্যসূত্র ১৯৯৮-৯৯ সনের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পৃঃ ২৮০)	৪ কোটি ৭০ লাখ ১২ হাজার টাকা
১২। ধানমণ্ডি লেক ও লেক সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প (তথ্যসূত্রঃ ঐ পৃঃ ২১২)	৯ কোটি ৬৯ লাখ ২০ হাজার টাকা।
১৩। শেখ ফজলুল হক মনি স্মৃতি মিলনায়তন, গোপালগঞ্জ—	৬ কোটি ৭০ লাখ ৪৩ হাজার টাকা।
১৪। মুজিব নগর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কেন্দ্র স্থাপন— (তথ্য সূত্র ঐ পৃঃ ২৭৮,)	১৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

**

এ ছাড়াও প্রতি বছর ক্ষমতাসীন দলের পরিবারের মৃত্যু ও জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে— ১৫ থেকে ২৫ রকমের রঙ্গীন পোস্টার বাবদ এবং প্রচার পত্র খরচ-আপ্যায়ন ও যাতায়াত

** (তথ্য সংগৃহীতঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৫-তম বর্ষ সংখ্যা, ৪ঠা জুন-২০০০, পৃঃ ২৫, লেখক সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন)

www.pathagar.com

ভাতাসহ সেমিনার অনুষ্ঠান সূচনা পর্ব থেকে সমাপনী পর্ব পর্যন্ত খরচ পড়েছে শত কোটির উপরে। এই খরচ প্রতিবছর কয়েকবার পক্ষকালব্যাপী হচ্ছে। ১০ হাজারের উর্দ্ধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম আত্মীয়করণ করার ফলে (ক্ষমতাসীন দলের) ব্যানার, প্রচার পত্র ছাপানোর খরচ ও নাম ফলক লাগানোর কাজে ব্যয় হয়েছে শত.শত কোটি টাকা। এর কোন হিসাব রাখা হয়নি। ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, দাতাগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রকল্পের সাহায্যের নামে জমাকৃত টাকা থেকে এই অপচয়গুলো করা হয়েছে। এই টাকার ব্যয় চড়া সুদে ও কর ধার্য করে জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করে। সব কিছুতেই থাকছে শুভংকরের ফাঁকি।

তৎকালীন পাকিস্তানের ৫ প্রদেশের একটি প্রদেশ ছিল বাংলাদেশ। জনবহুল ও ৯০ শতাংশ গরিব মানুষের এই ক্ষুদ্র ৫৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা বেষ্টিত এই দেশে যে পরিমাণ টাকা মন্ত্রী-মিনিস্টার ও সচীবদের পিছনে ব্যয় করা হয় তা বিশ্বের কোন উন্নয়নশীল দেশেও নেই। যেখানে ১০/১২ জন মন্ত্রী দিয়ে বাংলাদেশ (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান) পরিচালনা করা হয়েছিল সেখানে আজ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ও তাদের উপদেষ্টা মিলিয়ে প্রায় ১০০-এর অধিক লোক নিয়োগ রয়েছে। এদের এসি গাড়ি, চাকর-বাকর, বডিগার্ডের পিছনে যে খরচ পরে তা দিয়ে প্রায় ৫ হাজার দুঃস্থ নিরন্ন গরিব পরিবারের ভাল রকম অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ প্রতিবছর প্রায় দশ কোটি টাকা সরকারি কোষাগার থেকে শতাধিক লোকের ভরণ-পোষণের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। বিশ্বের অন্যতম গরিব একটি দেশের মন্ত্রীদের বিলাস বহুল জীবন যাপনের পিছনে যে অপব্যয় হচ্ছে তাও ট্যাক্স এর মাধ্যমে সরকার আদায় করে নিচ্ছে জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতি বছর। এক কথায় সরকারি এই অপব্যয়ের ব্যয়ভার বহন করছে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। অর্থনীতির এই অসামঞ্জস্যতার কারণে গরিব আরও গরিব হচ্ছে, ধনী আরও ধনী হচ্ছে। বিগত ১০ বছরে কথিত গণতান্ত্রিক সরকার সংসদে বসে শুধু অপ্রিয় বাক্যালাপে সময় ক্ষেপণ করেছে। সাংবিধানিক ভাবে এ সমস্ত ব্যাপারে জনগণের স্বার্থে কোন আইন রচনা করা হয়নি। আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী যিনি সব সময় জনগণের কথা দেশে-বিদেশে বলে বেড়ান, দরদী সাজেন, মাঝে মাঝে মায়া কান্নার অবতারণা করেন তাও আবার টিভি সেটের সামনে দাঁড়িয়ে। তার পিছনে ব্যয় হয় প্রতি বছর প্রায় ১৮ থেকে ২০ কোটি টাকা। প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ সফরের বহর যেমন দীর্ঘ তেমনি সময়কালও দীর্ঘ হয়। বিগত ২১ বছরে কোন রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মতো এতো বড় সফর সঙ্গী নিয়ে বিদেশ সফরে যাননি। বর্তমান সরকারের মন্ত্রীরাও নিম্নতম হাফ ডজন লোক না নিয়ে বিদেশে যান না। এর পিছনে প্রতি বছর যে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ভাণ্ডার থেকে খরচ হয় সেটাও জনগণের রক্ত ভেজা টাকা। বর্তমান সরকারের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম যিনি,

www.pathagar.com

তিনি হলেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। সবচেয়ে পরিতাপের ঘটনা যে সাধারণ মানুষদের নিয়ে আমরা বড় বড় কথা বলি—অথচ সংসদে বসে তাদের ভাগ্য রচনার কোন আইন রচিত হয় না। কিন্তু দলীয় এমপিদের ভরণ-পোষণের সুযোগ বৃদ্ধির আইন তৈরি হয়। এ কেমন ধরনের গণতন্ত্র বুঝে আসে না। স্বৈরাচারের প্রেতাত্মা যদি গণতন্ত্রের মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে সেই গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার দ্বারা জনগণের ভাগ্য কিভাবে রচিত হবে। সেটাই ভাববার বিষয়। সংসদে বসে অহেতুক বাক্যবাণ নিক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণমূলক অপ্রিয় উত্তপ্ত বাক্য বর্ষণে (যেখানে জাতির কোন কথা নেই) প্রতি ঘণ্টায় খরচ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা। এভাবে সংসদের কার্য দিবস চলাকালীন সময়ের হিসাব ধরলে বলা যায় ৫ বছর মেয়াদী একটি সরকারের প্রায় ২৫ থেকে ৩০ টি অধিবেশনে ৪ শ'র অধিক কার্য দিবস সংসদে হয়ে থাকে, তাহলে অহেতুক বাক্যালাপে, জাতি স্বার্থবিরোধী কার্য সাধনে সেখানে খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এ সমস্ত অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের ব্যয় রোদ কল্পে এমন একটি আইন সাংবিধানিকভাবে তৈরি করা উচিত—যেখানে ব্যাখ্যা থাকবে দেশে কতজন মন্ত্রী, প্রতি মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী থাকবেন। কি পরিমাণ তারা খরচ করবেন—এর বাধ্যবাদকতা সবকিছু মিলিয়ে খরচের একটি লিমিটেশন লিপিবদ্ধ থাকলে অপব্যয় রোধ করা সম্ভব। নিজেকে ভাল সরকার, ভাল দল, গণতান্ত্রিকভাবে নিজেকে জাহির করতে হলে প্রথমেই নিজেদের মধ্য থেকে শুদ্ধি অভিযান শুরু করতে হবে। গণতন্ত্রের প্র্যাকটিস প্রথমে নিজেদের মধ্যে চালু করতে হবে। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় রোধ করে সেই প্রমাণ রাখতে হবে দলীয় সরকারের এমপি ও মন্ত্রীদের সর্বপ্রথম। তাদের প্রদর্শিত পথই তখন অনুকরণীয় বিষয় হয়ে দেখা দেবে সবার জন্য। এভাবেই একটি দেশ ভাল হয়ে যায়, ভাল হয়ে যায় তার অর্থনীতি। সর্বশেষে বলব, জনগণ সরকারের এই অপব্যয় প্রতি বছর ট্যাক্সের মাধ্যমে আর দিতে রাজি নয়। কারণ নুন আনতেই তাদের পান্তা ফুরায় অবস্থা।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধক

খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদগণের ধারণা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন (চলমান রাজনীতি) ফ্রাঙ্কেস্টাইনে রূপ নিচ্ছে। রাজনীতি এখন দ্রুত বিকাশমান ব্যবসা। এটি এখন অর্থনীতির কালো অংশের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

দেশের ঝানু অর্থনীতিবিদগণ বিগত ১১-০৮-২০০০ ইং তারিখে ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট হলে অর্থনীতি সমিতির আয়োজিত সম্মেলনে কথাটি বলেছেন। একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় এসে বাংলাদেশের চলমান অর্থনীতি নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে অর্থনীতিবিদগণের কথাটি যৌক্তিকতার প্রমাণ মেলে। রাজনীতিবিদসহ সমাজের এলিট শ্রেণীই এই অপকর্মে লিপ্ত। দেশের সাধারণ মানুষ এ সমস্ত কাজে জড়িত নয়। তারা বাঁচার চিন্তায় অস্থির। তারা সকাল-সন্ধ্যা দুমুঠো অন্নের জন্য জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ এবং এলিট শ্রেণীরাই জনগণের ও সমাজের কথা না ভেবে তাদের পেছনে ফেলে বিলাসের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছেন। দেশটাকে তারা লুটের আখরায় পরিণত করেছেন। নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিধিরাই সন্ত্রাসীদের লালন করছেন। উচ্চমূল্যে সন্ত্রাসীদের সার্ভিস কিনছেন।

লন্ডনের সমান হয়ে গেছে ঢাকার জমির দাম। সেজন্য দখলী রাজত্ব শুরু হয়েছে সর্বত্র। জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়লেও সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধির তুলনায় তা অনেক কম। রাজনীতি এখন সমাজ সেবা নয়—সেবার আড়ালে মোক্ষম ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। যারা রাজনীতিতে নাম লেখান বা সদস্য ফরম পূরণ করে সদস্য হন তার আগেই একটা হিসাব নিকাশ করে রাখেন মাসিক কত টাকা রোজগার করা যাবে। অপ্রিয় শোনালেও সত্য দেশের কোটিপতির সংখ্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক লোক রাজনীতি পেশায় জড়িত। কালো টাকার মালিকদের কাছে রাজনীতি ও সংসদ জিম্মি। সন্ত্রাসের মদদ দাতা এলিট শ্রেণীরাও এখন আর রাস্তায় নিরাপদ নয়, অথচ সন্ত্রাস বৃদ্ধির জন্য এরাই দায়ি বেশি। ধনী আর গরিব বলে কোন কথা নয়, রাজনীতির দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত কিন্তু প্রশ্নটা হলো সততা। এই সততার অভাবটাই দেশে সবচেয়ে বেশি। মূলত দেখা যায়—নির্বাচনে যে যতো বেশি টাকা ব্যয় করতে পারবে সেই বড় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পায়। তাই নির্বাচনে কালোটাকার মালিক টাকার বস্তা নিয়ে রাজনীতিতে নামছেন। এলাকায় নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন। চরিত্র আছে কি নেই ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হলো টাকা আর চাপার জোর। টাকার জোরে এমপি হচ্ছেন, মন্ত্রী হচ্ছেন। অথচ দেশ ও জাতির প্রতি কোন অঙ্গিকার নেই। এমপি আর মন্ত্রী হয়ে ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনের খরচের কয়েকগুণ বেশি টাকা রোজগার করছেন।

www.pathagar.com

বিদেশে ছেলে-মেয়েদের জন্য ফ্লাট কিনছেন। টাকা পাচার করছেন। পড়াশুনার ব্যবস্থা করছেন। অনেকে সেখানে থেকেও যাচ্ছেন। বাংলাদেশ হলো তাদের জন্য রোজগারের স্থান আর বিদেশ হলো বিনিয়োগের স্থান। দেশ জাহান্নামে চলে গেলেও তাদের অসুবিধা নেই। এই হলো আমাদের এক শ্রেণীর এলিট রাজনীতিবিদদের দেশ প্রেমের নমুনা। এসব শিকড়বিহীন মানুষেরাই নিজ দেশের ভাগ্য বিধাতা আজ। এসব লোকদেরই আমরা মাথার মুকুট বলে মনে করি। কারণে অকারণে শ্রদ্ধা করি। তাদের কথাকে দেব বাক্য বলে মনে করি।

দেশ আজ ভোগবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে ক্ষতবিক্ষত। কালো টাকার মালিক, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গডফাদাররা যদি সংসদে বসেন, সেই সংসদ থেকে জনহিতকর কাজ কি করে আশা করা যায়? এ প্রশ্ন আজ অনেকের হৃদয়ের ভিতর থেকে গুমরে উঠছে। দেশের সৎ ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা কর্মী যে নেই তাও নয়—তবে সৎ ও নিষ্ঠাবান নেতা কর্মী রাজনৈতিক অঙ্গনে কোণঠাসা। কারণ চাপার জোর, অর্থের জোর, বাহুর জোর তাদের নেই। শুধু আছে তাদের নৈতিকতার জোর। কিন্তু এই নৈতিকতার জোর চলমান রাজনীতিতে অচল বিধায় তাদের নির্বাচনে প্রার্থী করা হয় না। এমন কি প্রশাসনের দায়িত্বপূর্ণ পদে তাদের নিয়োগ করা হয় না। নির্বাচনে কে কতটাকা ব্যয় করতে পারবেন—কার কত মাস্তানী ক্যাডার আছে—জাল ভোট দেয়ার যোগ্যতা আছে রাজনীতিতে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। লোকটি সৎ কিনা, নীতিবোধ আছে কিনা, দেশের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সাধারণ মানুষ তাকে ভালবাসে কিনা—ইত্যাদি গুণগুলো বিবেচনা করেন এমন রাজনৈতিক দল দেশে নেই বললেই চলে। টাকা দিয়ে দুর্বৃত্তরা সেবা কিনছে। অথচ সাধারণ মানুষ সেই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ সেবা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, এতে মানবিকতা ও হৃদয়ের স্পন্দন নেই। দেশের সাধারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভোটের মালিক। কিন্তু ক্ষমতার মালিক নয়। দুঃখজনক টাকা ও সন্ত্রাস দ্বারা সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হচ্ছে। ভোট না দিলেও ভোট কাউন্ট হয়ে যায়। রাজনীতিতে এমনই এক জটিল নোংরা অবস্থা বিরাজ করছে—যা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

সাবেক অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান অর্থনীতি সমিতির সমাপনী অনুষ্ঠানে (আগস্ট ১৩, ২০০০) বলেছেন—বাংলাদেশের রাজনীতির যে অবস্থা তাতে কোন সরকারের পক্ষে দেশ পরিচালনা সহজ নয়। রাজনীতি এখন পুঁতিগন্দময়, এতে পচন ধরেছে। আমরা জাতিকে বিভক্ত করে যার যার পক্ষে টানছি। এই টানা টানিটাই আমাদের আরও পিছনের দিকে নিয়ে গেছে। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায়-রাজনীতিকে শাসন করার মত কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই অথচ সরকারের সব বিভাগেই জবাবদিহিতার প্রয়োজন রয়েছে। সংসদ নেত্রী ও বিরোধী নেত্রী থেকে শুরু করে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যারা সংসদে এসেছেন সবারই তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহী করতে হবে। যে ওয়াদা পালনের লক্ষ্যে এমপি হয়েছেন সেই ওয়াদা এলাকা ভিত্তিক কে কতটা পালন করছেন—তার জবাবদিহি কয়জন করেছেন? প্রধানমন্ত্রী থেকে এই চর্চা শুরু করতে হবে প্রথম। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বহু ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে

www.pathagar.com

তার দলকে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছেন—সুতরাং তার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কথায় বলে, কর্তা যেদিকে যায় অর্থাৎ নেতা যে পথ অবলম্বন করে কর্মীরাও সেই পথ অনুসরণ করে। প্রধানমন্ত্রী রেডিও টিভির স্বায়ত্ত শাসন থেকে শুরু করে সন্ত্রাস দমন, অতীতের অপশাসন থেকে বিরত থাকা, স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট বাতিলসহ আরও বহু ওয়াদা পূরণের কথা বলে ক্ষমতায় এসেছেন—তার কয়টি তিনি পূরণ করেছেন এই জবাবদিহিতা তিনি জনসন্মুখে দাঁড়িয়ে করেছেন কি?

রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগকে প্রথম জবাবদিহি করতে হবে, সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের মন্ত্রীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। তারপর ক্রমান্নয়ে এই ধারা চালু করা যেতে পারে আইন ও বিচার বিভাগের ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা না থাকলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তেমনি দুর্নীতিও দূর করা সম্ভব নয়। অপ্রিয় সত্য রাজনৈতিক দলগুলো জাতিকে বিভক্ত করেছে। জাতির মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করতে পারেনি। সংঘাতময় দিক নির্দেশনাহীন রাজনীতি দেশে কাল মেঘের জন্ম দিয়েছে। অর্থনীতি সমিতির তিনদিনের সেমিনারে খ্যাতমান অর্থনীতিবিদদের বক্তব্যের সার সংক্ষেপ ছিল উল্লেখিত বিষয়গুলো—(যুগান্তর, মানব জমিন, দৈনিক ইনকিলাব ১১,১২,১৩,১৪ আগস্ট ২০০০)। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে—রাজনীতিকে দুর্বৃত্ত মুক্ত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করতে হবে, সংস্কার করতে হবে। রাষ্ট্রীয়ভাবে রাজনৈতিক নীতিমালা সংসদে বসে পাস করতে হবে। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই হয়তো গণতন্ত্র তার অবস্থানে সুদৃঢ় হবে ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নও তখন সম্ভব হবে।

www.pathagar.com

খেলাপি ঋণে বিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি

ব্যাংক ঋণ খেলাপি, গ্যাস বিল খেলাপি, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল খেলাপি, আয়কর খেলাপি অর্থাৎ খেলাপি ঋণ ও বিলের বকেয়া জালে আটকা পড়ে আছে দেশের অর্থনীতি। যথাসময়ে ঋণ ও বকেয়া বিলের টাকা পরিশোধ না করার কারণে—রাজস্ব আয় কমে যাচ্ছে। রাজস্ব আয় কমে গেলে অন্যদিকে রাজস্ব ব্যয় বেড়ে গেলে বাজেটে ঘাটতি হতে বাধ্য। সূত্র বলেছে বিভিন্ন খাতে বকেয়া পাওনার পরিমাণ ৬৮০ কোটি টাকা এবং ব্যাংক ঋণ খেলাপির পরিমাণ প্রায় ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) কোটি টাকা। মামলা হয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে কয়েকবার কিন্তু ঋণ তেমন আদায় হয়নি।

১৯ নভেম্বর ২০০০ জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তরকালে অর্থমন্ত্রী এ এস এম কিবরিয়া বলেছেন, ১২ হাজার ৮ শ' ৩৮ জন ঋণখেলাপির কাছে ১৬ হাজার ২০০শ' ৬০ কোটি ৩০ লাখ টাকা পাওনা রয়েছে। দেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহে বর্তমানে দশ লাখ ও তদূর্ধ্ব টাকা ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ১২ হাজার ৮ শ' ৩৮ জনই ঋণখেলাপি। এর মধ্যে সোনালী, রূপালী, জনতা ও অগ্রণী এই চার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেই ঋণখেলাপির সংখ্যা ৭ হাজার ৮শ' ৩৮ জন। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী এই ১২ হাজার ৮শ' ৩৮ জন ঋণখেলাপির কাছে মোট ১৬ হাজার ২ শ' ৬০ কোটি ৩০ লাখ টাকা খেলাপি ঋণ রয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী সংসদকে জানিয়েছেন (সূত্র ঃ দৈঃ জনকণ্ঠ, ২০/১১/২০০০)। সংসদের ১৮১ জন সংসদ সদস্যই আয়কর দেন না। দেশের প্রতি এক হাজার জনের মধ্যে নয়শত পঁচানব্বই জন কর দেন না। অর্থাৎ ৩৩০ জনের মধ্যে ১ জন মাত্র করদাতা (সূত্র ঃ প্রথম আলো ০২/১১/২০০০)। বাংলাদেশে ২০০১ –২০১০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর বৈদেশিক ঋণের সরবরাহের পরিমাণ হবে ৫০ কোটি থেকে ৭০ কোটি ডলার ২০০৭ সালে দেশটির জন্য বৈদেশিক ঋণের বোঝা অসহনীয় হয়ে উঠবে। বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে এ তথ্য জানা যায়। বিশ্ব ব্যাংক সূত্র থেকে আরো জানা যায়, বাংলাদেশ ১৯৭২ সাল থেকে গত ২৭ বছর বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে মোট ৩,৪৮০ কোটি ডলার পেয়েছে। এই সাহায্যের মধ্যে ১৬৮০ কোটি। ডলার এসেছে মঞ্জুরি সাহায্য হিসেবে এবং বাকি ১৮০০ কোটি ডলার এসেছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (আইডিএ) শর্তাধীনে। রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ১৪৮০ কোটি ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ অর্থ বছরে বার্ষিক ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিলো ৭৭ কোটি ৩০ লাখ ডলার (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব–১৮/১১/২০০০)। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের চাপ জাতির জন্য আরেকটি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখিত কারণে দেশের জনগণের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৯শ' ৯ টাকা ১৯ পয়সা এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু ঋণের এই টাকা প্রতিবছর সুদসমেত পরিশোধ করতে হয়। ১৩/৯/২০০০ বুধবার সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বর্তমান অর্থমন্ত্রী এ এস এম কিবরিয়া কথাটি স্বীকার করেছেন।

www.pathagar.com

২১/১১/২০০০ দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় লিখেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের ব্যবহারের লক্ষ্যে বিমান ক্রয়ের জন্য ৩শ' কোটি টাকা ব্যয়। বিশ্বব্যাংক এটাকে মারাত্মক অপচয় বলে অভিহিত করেছে। বৈদেশিক ঋণের টাকা কিভাবে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করা হচ্ছে এটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮ টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিল্প ঋণ সংস্থার ৮শ' কোটি টাকা যার পুরোটাই হলো ঋণখেলাপি (দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ২২/১১/২০০০ এ সংবাদ উঠেছে। এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিনই কাগজে উঠছে।

ঋণ খেলাপি কারা, মানুষের মধ্যে এরা কোন শ্রেণীর মানুষ। এরা কিভাবে ঋণ পায়, কাদের সহযোগিতায় প্রতি বছর এ. কোটি কোটি টাকা ঋণ পাচ্ছে এ নিয়ে সবিস্তারে দু'একটি কথা লিখতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক শত্রু চিহ্নিত করতে অপারগ হলে— আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কখনোই আশানুরূপ অবস্থায় রূপ নিবে না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত—এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, সরকারি আমলা ও ব্যবসায়ী ঋণ গ্রহীতার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। এরাই স্বনামে, বেনামে শিল্প উন্নয়নের কথা বলে প্রতি বছর ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করছে এবং সেই টাকা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করছে। ব্যাংক ঋণ পেতে কখনোই বেগ পেতে হয় না—অতি সহজে আত্মীয়দের দোহাই দিয়ে উপরোক্ত লোকদের সহযোগিতায় এই কাজ তারা হাতিয়ে নেয়।

দেশে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কোটিপতির সংখ্যা ছিলো ৪৩৫ জন। ২০০০ সালে এসে দাঁড়িয়েছে কোটিপতির সংখ্যা ১৮০৭ জন। এরা কিভাবে কোটিপতি হলো এক তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে অধিকাংশই দখলীসত্বে ও অসৎ উপায়ে টাকা উপার্জন করে ধনীর খাতায় নাম লিখিয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে, বিভিন্ন খাতের বকেয়া বিল পরিশোধ না করে, হুন্ডির মাধ্যমে চোরাচালানি ব্যবসা করে এরা কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। ঋণ গ্রহীতারা ব্যক্তি উন্নয়নে টাকা ব্যয় করে নিজেরা কোটিপতি হয়েছেন বটে কিন্তু ব্যাংক ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকে দেউলিয়াগ্রস্ত করে তুলেছেন। ব্যাংক দিতে পারছে না তাদের কর্মচারীদের বেতন তেমনি দেশকে স্বনির্ভরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন অথচ কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন কোটিপতিরা। সরকারের ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লোকের সাথে ঘুষের বিনিময়ে প্রকৃত আয় ও সম্পদের উপর ট্যাক্স না দিয়ে কোটি কোটি টাকা ফাঁকি দিয়ে রাজস্ব আয় থেকে সরকারকে বঞ্চিত করছেন। এ তথ্য প্রায়ই কাগজে বের হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ট্যাক্স পেয়ার ও ট্যাক্স রিসিবার উভয়ে দায়ি এবং দোষীও বটে। দুঃখজনক যে সেবার মান আজ নিম্নস্তরে নেমে গেছে। সেবা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো লুটপাট ও আখের গুছানো কেন্দ্র হয়ে গেছে। এ দেশে কোটি কোটি টাকার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে থাকে। প্রশাসনে ঘুষের উপস্থিতিতে এই বিদ্যুৎ দস্যুতা চলছে। বর্তমান বকেয়া সংস্কৃতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিদিন হৃদপুষ্ট হচ্ছে। কোন বিদেশি কোম্পানি যদি জানতে পারে আমরা বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের টাকা পরিশোষ করি না তাহলে কি তারা বিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ করবে? মানুষ বিনিয়োগ করে মুনাফার জন্য—ক্ষতির সম্ভাবনা যেখানে প্রবল সেখানে কোন কোম্পানি বিনিয়োগ করতে আসবে না। একটি বিশ্বস্ত তথ্যে

www.pathagar.com

জানা যায়—সরকারের পিডিবি'র সিস্টেম লস যেখানে প্রায় ৪০ ভাগ সেখানে বেসরকারি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিস্টেম লস প্রায় ১৭ ভাগ। অর্থাৎ অপচয়, সিস্টেম লস ও বকেয়া পাওনা সবকিছুই বেসরকারি তুলনায় সরকারি খাতে বেশি হচ্ছে। বিদ্যুৎখাতের লোকসান কমানোর জন্য ডেসার জন্ম হয়েছিল, কিন্তু দেখা যায় এই ডেসার জন্মের পর সিস্টেম লস প্রায় ৬০ ভাগের ওপর বেড়ে গেছে। সিস্টেম লস নয় এটা আমাদের ক্যারেক্টর লস। ক্যারেক্টর ঠিক করতে না পারলে অর্থাৎ বিদ্যুতে সরকারি বকেয়া পরিশোধ করতে না পারলে বিদ্যুৎ খাতে বিদেশী বিনিয়োগ আহবান করলে উল্টো প্রতিক্রিয়া হবে। এটা তখন মুক্ত বাজারের নামে প্রহসনের রূপ নিবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যখন একটি সিস্টেমের আওতায় চলে আসবে তখনই মুক্ত বাজার অর্থনীতি কার্যকরী রূপ নিবে।

এ ক্ষেত্রে যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হলো বকেয়া বিল পরিশোধের ব্যাপারে সে প্রধানমন্ত্রী হউক, বিরোধী দলের নেত্রীই হউক, প্রেসিডেন্ট হউক, পিডিবির চেয়ারম্যান হউক, বা বিদ্যুৎমন্ত্রীই হউক—অর্থাৎ সে যেই হউকনা কেন সরকারি বকেয়া বিল পরিশোধ না থাকলে লাইন কেটে দেয়ার মতো সৎ সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। রাষ্ট্র যখন এই কাজটি করতে পারবে তখনই মুক্ত বাজারের দামামা সঙ্গীত বাজানোর সার্থকতা লাভ করবে। মুক্ত বাজার বা খোলা বাজারের স্লোগান মাঠে ময়দানে ও সেমিনারে দিয়ে যারা পণ্ডিতি জাহির করছেন তাদের উচিত হবে দেশের ফিনেনসিয়াল সেক্টরসমূহ বিশেষ করে ব্যাংক, বীমা, ট্যাক্স, রাজস্ব বিভাগ ও বিনিয়োগ বোর্ড স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পেরেছে কিনা প্রথমে তা পর্যবেক্ষণ করে দেখা। বার্ষিক প্রতিবেদন বা জুনের বাজেটে উদ্বৃত না ঘাটতি—সব কিছু নিরীক্ষকের মাধ্যমে খতিয়ে দেখে বিচার বিবেচনা করে সবকিছু জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে হলেই বুঝতে পারবো মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা ম্যাক্রো ইকোনমি স্টাবিলিটিতে আমরা আর পিছিয়ে থাকবো না। অন্যভাবে ভাবলে যেমন খেলাপি ঋণ আদায়ে সরকারের ব্যর্থতা, কর আদায়ে সরকারের ব্যর্থতা, বকেয়া বিল আদায়ে ব্যর্থতা, শেয়ার বাজারের শেয়ার সূচক সবসময় যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে, তাহলে ডেফিসিট বাজেট নিয়ে মুক্ত বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হবে। কোন ব্যাপারে সফলতা অর্জন করতে হলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে এগুতে হবে। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবে আমরা উন্নতি করতে পারছি না। বিশ্ব বাজার প্রতিযোগিতায় আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি এ কারণে। বাজার অর্থনীতি, থেকে সুফল পেতে হলে উল্লেখিত খাত বা সেক্টরসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অতিজরুরি। তাহলেই বাজার অর্থনীতির যে কোন প্রতিযোগিতায় (অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে) আমরা উত্তীর্ণ হতে পারবো।

www.pathagar.com

টি এন টি বোর্ডের আমূল সংস্কারের প্রয়োজন

আধুনিক যুগের সবচেয়ে সহজতম যোগাযোগের মাধ্যম হলো টেলিফোন। যোগাযোগ যত উন্নত ও দ্রুত হবে অর্থনৈতিক অবকাঠামো ততো বেগবান হবে। এতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে। দারিদ্র্যও প্রশমিত হবে। মান্ধাতা আমলের মতো আজকের যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের টাকা পয়সা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আদান-প্রদান অচল বললেই চলে। এর পরিবর্তে এসেছে—টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স ইমেইল ক্রেডিট কার্ড, এ, এম, টি (মানি লিং) ও ইন্টারনেট যার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার তহবিল এক মিনিটে স্থানান্তরিত সম্ভব। এই মাধ্যমগুলির আধুনিক উপায়ে সংস্কারের প্রয়োজন। মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে টেলিফোনের ভূমিকা সারাদিন লিখলেও শেষ হবে না। টেলিফোন ছাড়া বাজার অর্থনীতি একদম অচল। মিডিয়া, এ্যাড, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি অফিস আদালত সবকিছুই স্থবির হয়ে যাবে যদি টেলিফোন নামক যন্ত্রটি একদিনের জন্য বন্ধ থাকে। অর্থনীতির এমনই একটি মাধ্যম যদি দুর্নীতিগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত থাকে তাহলেই বিপদ।

বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্র ও শত শত টেলিফোন গ্রাহক অভিযুগের সুরে বলছে টি এন্ড টি বোর্ডের টেলিফোন বিভাগের নানা ত্রুটির কথা। টেলিফোন লাইন পাবার সকল আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার পরও টেলিফোন পেতে হলে সময় লাগে ৬ মাস থেকে দীর্ঘ ৪/৫ বছর। তদবীর করার মতো লোক থাকলে হয়তো সময়ের কিছু হেরফের ঘটতে পারে। হয়তো মোটা অংকের টাকা খরচ করলে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে পারে। তখন ক্যাবল সমস্যা থাকে না। নতুবা অপেক্ষা করতে হবে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কর্তা ব্যক্তিদের দয়ার উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দিতে হয় এই সহজলভ্য জিনিসটি করায়ত্ত করতে গেলে। উন্নয়নশীল বিশ্বে গ্রাহকদের এই কাজটি করে দেয়ার জন্য অতি উৎসাহের সাথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায় ফেরি করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজন। তাদের তাগিদা দিতে হয় না নিজের কর্তব্যের টানে তারা কাজটি করতে যায়। টেলিফোন গ্রাহক তার আগ্রহের কথা প্রকাশ করার সাথে সাথেই আর যেন বিলম্ব নয়, মনে হয় এখন দায়িত্ব আর গ্রাহকের নয়—সংযোগ প্রদান করার দায়িত্ব এখন সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকজনদের। বিশ্বের বহুদেশে এটা এখন ব্যক্তি মালিকানায় চলে এসেছে। কিন্তু আমাদের এখানে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি মান্ধাতা আমলের ঢিলে ঢালার মতো চলছে। সরকারি কর্মকর্তাদের একক ইচ্ছা, ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের হুমকি-দমকি, মনে হয় যেন সরকারি টি এন্ড টি দফতর তাদের বাপ-দাদার তালুক। সরকারি সম্পত্তির অর্থই বুঝায় জনসাধারণের সম্পত্তি, এর রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে গ্রাহক সেবা সবকিছুই জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করাকে বুঝায়। কিন্তু তা হতে দেয়া হচ্ছে না সংশ্লিষ্ট বিভাগের

www.pathagar.com

মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর আপার লেবেলের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়নের খবরদারি ও আধিপত্যের কারণে। বাজার অর্থনীতির সেবা করতে যারা আগ্রহী তাদের বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে যথাসময়ে টেলিফোন লাইন সংযোগ না দিয়ে। এটাও এক ধরনের অর্থনৈতিক অপরাধ। আবার যারা টেলিফোন লাইন পেয়েছেন তারা নিয়মিত বিল পরিশোধ না করে সরকারকে রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত করছেন—তারাও আরেক ধরনের অপরাধ করছেন। নিয়মমাফিক যারা সংযোগ দিচ্ছে না, উপরি পাওয়ার আশায় গড়িমসি করছেন একদিকে সংযোগ প্রদান না করে তারা দেশের অর্থনীতির ক্ষতি করছেন তেমনি সংযোগ পাওয়ার পর যারা সময়মতো বিল পরিশোধ করছে না উভয়েই রাষ্ট্রীয় দর্শনে অপরাধী বলে চিহ্নিত। দু'গ্রুপের লোকরাই দেশের অর্থনৈতিক শত্রু।

অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন বা উল্লেখিত বিষয়টি নিয়ে বিবেকে প্রশ্ন জাগতে পারে—দেশের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে অবকাঠামোর কোন কোন খাতকে শায়েস্তা করতে হবে। উত্তর হবে—তার মধ্যে অন্যতম খাতটি হলো টেলিফোন এবং এই খাতটির ব্যবস্থাপনাও সবচেয়ে দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত। সবাই এক বাক্যে এই কথাটি যে বলবেন এতে কোন দ্বিমত নেই।

টেলিফোনের পর আর যে সমস্ত খাতকে শায়েস্তা এবং পরিশুদ্ধ করা প্রয়োজন—ধারাবাহিকভাবে সে-খাতগুলি হলো পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। উল্লেখিত পাঁচটি খাতই একটির সাথে আরেকটি অতোপ্রোতভাবে জড়িত। দেহের সাথে নাড়ির যেমন সম্পর্ক তেমনি টেলিফোন, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও সড়ক যোগাযোগ একের সাথে অন্যের তেমনি সম্পর্ক। একটি বাদ দিয়ে অন্যটির উন্নতি চিন্তা করা যায় না।

সামগ্রিকভাবে দেশকে উন্নতি করতে হলে সমভাবে পাঁচটি খাতের তদারকি করতে হবে। কেউ হয়তো বলতে পারেন অতি দেশপ্রেমের ভাব নিয়ে—এগুলোতো বড় লোকের জিনিস। দরিদ্র লোকের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। বড় লোকরাই এগুলো ভোগ করছে। এগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থই হলো—বড় লোকদের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করা। আপাত দৃষ্টিতে কথাটি সত্য হতে পারো—কারো কারো মনোসন্তুষ্টি পাবারও সুযোগ আছে। কিন্তু অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। আধুনিক যুগের বাহন যন্ত্রচালিত গাড়ি। রিক্সা বা ঘোড়ার গাড়ি নয়, পেট্রোলের দাম বাড়লে, কমলে-গরিব ধনী সবাই সমভাবে এর ভাগীদার হতে হয়। কারণ ধনী গরিব সবাই গাড়িতে করে আজকাল দৈনন্দিন কাজ সম্পূর্ণ করেন। আসল কথা হল অর্থনীতি। এই অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগ, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু অবকাঠামো। বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে টেলিফোনের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে—উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কর্মসংস্থান বাড়বে। সুতরাং বিনিয়োগের সাথে টেলিফোনের সম্পর্কই ঘনিষ্ঠ।

টেলিফোন নামক খাতটিকে বিশৃঙ্খলামুক্ত করতে হলে, এই খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, প্রয়োজন হলে খাতটিকে প্রাইভেটাইজেশনে দিয়ে দিতে হবে। টেলিফোন খাতটি উন্নতি করলেই দেশের অর্থনীতির মোড় ঘুরে যাবে। দেশের অধিক ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ টেলিফোনের মাধ্যমে সমাধা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগের যোগাযোগের মাধ্যম হলো টেলিফোন। যোগাযোগের মাধ্যম যত সুষ্ঠু ও উন্নত হবে—দেশের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তত বেগবান হবে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পাবে। টেলিফোন শহরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। গ্রাম-গঞ্জে এটা পৌঁছে দিতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান ব্যক্তি যিনি একজন ভাল অর্থনীতিবিদ নাম অধ্যাপক ইউনুস সাহেব। তিনি আজ গ্রামগঞ্জে গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে মোবাইল টেলিফোন দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। অনেক জায়গায় সেলুলার টেলিফোন সরবরাহ করেছেন। দুঃখজনক যে বরিশাল শহরে সম্প্রতি গ্রামীণ ব্যাংকের সেলুলার টেলিফোন বিক্রয় কেন্দ্রে হামলা হয়েছে। সরকারি দলের লোকেরা দলীয়করণের মাধ্যমে এটি বাজারজাত করতে চেয়েছেন—সেই লক্ষ্যে এই হামলা। প্রসঙ্গ নিয়ে যে কথাটি বলা দরকার তা হল—ডক্টর ইউনুস সাহেব ভেবেছেন দেশের অর্থনীতির পুরোটাই যোগান দিচ্ছে গ্রাম—সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে সর্বপ্রথম, গ্রামই অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। আজ বিদেশী বিনিয়োগকারীরাও এখানে লাখ লাখ ডলার বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এতে লাভ বহুমুখি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হলে স্বল্পমূল্যে গ্রাহকরা টেলিফোন নামক বস্তুটির সংযোগ লাইন অনায়াশেই পেয়ে যাবে। বিনিয়োগকারী কোম্পানিগুলো তখন কত স্বল্প মূল্যে ভাল মানের সার্ভিস দিতে পারে সেজন্য গ্রাহকদের দরজায় ধর্না দেবে। টাকার বিনিময়ে ডিমাণ্ড নোট জমা দিয়ে এ্যাডভাইস নম্বর পাওয়ার ছয় ঘণ্টার মধ্যে লাইন পেয়ে যাবে গ্রাহকরা, লাইনে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে—তাও নিম্নতম সময়ে সমাধান হয়ে যাবে—কারণ প্রতিযোগিতা। তখন সবাই চাইবে সেবার মান উন্নত ও অত্যাধুনিক রাখতে। টি এণ্ড টি বোর্ড যে কাজটি করতে আজ ব্যর্থ হচ্ছে সেই কাজটি প্রাইভেটাইজেসনে গেলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হবে বিধায় সহজমূল্যে, সহজ উপায়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে টেলিফোন নামক যন্ত্রটি।

সাময়িকভাবে—একটি বাধা হয়তো আসবে গ্রাহকেরা যদি অতি সহজে লাইনটা পেয়ে যায় তাহলে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা কিভাবে বলবে আমরা গরিবের বন্ধু—দুর্নীতিপরায়ণ অফিসাররাও কিভাবে বাঁচবে। সেজন্য প্রাইভেটাইজেসনের বিরুদ্ধে কারও কারও আপত্তি রয়েছে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির জন্য এই প্রযুক্তিটি যে কি প্রয়োজন তা বলে শেষ করা যাবে না। এক কথায় যার উত্তর টেলিফোন ছাড়া দেশ অচল, অচল তার অর্থনীতি। সুতরাং এই দপ্তরটির আমূল সংস্কার আশু প্রয়োজন।

www.pathagar.com

রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা ২০০৫ সালে জাতিকে আরও ঋণের ফাঁদে জড়াবে

স্বাধীনতার ত্রিশ বছর আমরা পিছনে ফেলে এসেছি। ২০০৫ সালে বাংলাদেশের বয়স হবে ৩৫ বছর। আগামী ৫ বছর পর বাংলাদেশের অবস্থা কেমন হবে বিগত ৩০ বছরের দিকে ফিরে তাকালেই তার একটি অংক বের করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয় না। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এই ২৪ বছর আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তার একটি হিসাব নিলে বুঝতে পারবো বিগত ৩০ বছর আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কতটুকু এগিয়ে গেছি এবং আগামী ৫ বছরে আমরা কতটুকু এগুতে পারবো তারও একটি অংক অবশ্যই দেশের ঝানু অর্থনীতিবিদ সাবেক প্রতিমন্ত্রী ডঃ মঈন খান এবং বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সাহেব অতি সহজেই তা অনুমান করতে পারবেন। সম্প্রতি এই দুই মহান ব্যক্তি দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বেশ কিছুদিন ধরে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছেন। তারা বর্তমান সরকারকে ব্যাংক দেউলিয়া ও ঋণ খেলাপি সরকার হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারণ বিগত ১১ মাসে (জুলাই ৯৯ থেকে মে ২০০০ পর্যন্ত) সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে ৪ হাজার ২ শত কোটি টাকা (যুগান্তর ৬/৬/২০০০)। এই রেকর্ড অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। চড়া সুদে এই টাকাগুলো সরকারকে পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং রাজস্ব ব্যয় বেড়ে যাবে। হাসিনা সরকার গত ৪ বছরে ব্যাংক থেকে মোট ঋণ নিয়েছে ১০ হাজার ৬ শত ৮৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। অতীতের কোন সরকার এত বেশি টাকা ঋণ নেয়নি। খালেদা সরকার ৯১-৯৬ এই ৫ বছরে ঋণ নিয়েছিল ৫ হাজার ৫ শত কোটি টাকা। অর্থাৎ বর্তমান সরকার অতীতের সরকারের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ঋণ নিয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিভিউ অব বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট (আই, আর, বি, ডি.) সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন সরকারের ঋণ গ্রহণের এহেন প্রবণতার কারণে চাপ পড়েছে নির্মাণ খাতে। রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ঘাটতির কারণে বৃহদাকারের বার্ষিক উন্নয়নও থেমে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে বেসরকারি খাতে সুদের হার উচ্চ হবার কারণে মূলধনী ব্যয়ও বেড়ে যাচ্ছে। শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দ্যোগও থেমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতি হিসেবে দেখা যাচ্ছে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি।

বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্ণর ফরাস উদ্দিন সাহেব সম্প্রতি অর্থমন্ত্রীকে এত বেশি ঋণ গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে বলেছেন। এই ঋণের টাকা কোথায় কিভাবে ব্যয় হয়েছে তাও খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন রাজস্ব ঘাটতি যখন বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পাচ্ছে তখন রাজস্ব ব্যয় কমানো দরকার। বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীকে জানানোর জন্য অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন। রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেছেন বর্তমান রাজস্ব ঘাটতি (৯৯-২০০০) রয়ে গেছে প্রায় ১৬ শত ৪১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ হাজার ৯শত ২৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে বিগত ৯ মাসে ১০ হাজার ২ শত ৮৬ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ যেমন দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য সংকট তৈরি করছে ঠিক তেমনি বিদেশী ঋণ সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশকে ঋণ পরিশোধ করতে হয় বছরে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (সূত্র ঃ দৈঃ মানব জমিন ১০/০৫/২০০০)। সুতরাং বলতে হয় দেশে বর্তমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। এই যদি অবস্থা হয় এবং তা যদি সুষ্ঠভাবে সমাধা করার চেষ্টা করা না হয় তা হলে দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ খুবই ভয়াবহ রূপ নেবে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আই এম এফ বলেছে যে বাংলাদেশের বর্তমান বাজেটের ঘাটতি মিটানোর জন্য ব্যাংক ঋণের ওপর সরকারের নির্ভরশীলতা মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। এমন কি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ওপর চাপ আরও বাড়বে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার উর্দ্ধমুখী হবে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের ৮ জুনের বাজেটের উপর আই এম এফ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন (তথ্য সূত্র ঃ দৈঃ জনকণ্ঠ ২২/০৬/২০০০)।

দেশ স্বাধীনের পূর্বে যে সমস্ত মিল কারখানা চালু ছিল বর্তমানে তার অধিকাংশই রুগ্ন অবস্থায় রূপ নিয়েছে। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ পাট কল আদমজী এ পর্যন্ত শুধু একবার লাভের মুখ দেখেছে তাও এরশাদের আমলে। খুলনা নিউজ প্রিন্ট, প্রগতি মটর কারখানা ও চিনি শিল্পসহ আরো অনেক কোম্পনি লোকসানের খাতায় নাম লিখিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০-এ যে তথ্য পাওয়া গেছে তা হলো ১৫ টি রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান লোকসানের খাতায় নাম লিখিয়েছে চলতি বছর। সমীক্ষার তথ্যানুযায়ী রাষ্ট্রীয় খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠানের চলতি অর্থবছর (৯৯-২০০০) লোকসান দিয়েছে ১ হাজার ৬ শত ৯৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১১ টি সেক্টর কর্পোরেশনকে মোট ভর্তুকী দেয়া হয়েছে ১ শত ৩৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের ৪ হাজার ৪ শত ৩৭ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ঋণের মধ্যে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা যা মোট ঋণের ৪৭ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় খাতগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশন (বি টি এম সি) লোকসান দিয়েছে ৫৩ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রোকৌশল কর্পোরেশন (বি এস ই সি) ২০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বি এস এফ আই সি) ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প কর্পোরেশন (বি সি আই সি) ২১২ কোটি ৮০ লাখ টাকা, বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশন ২৬৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বি পি ডি বি) ৯৬০ কোটি টাকা, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) ৩৫৭ কোটি টাকা, চট্টগ্রাম ওয়াসা ৬ কোটি টাকা, বাংলাদেশ বিমান কর্পোরেশন (বিবিসি) ১৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ১ হাজার ৬ শত ৩৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বি জে সি) ২০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বি এ ডি সি) ২৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কতৃপক্ষ ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়েছে (সূত্র ঃ যুগান্তর ৯/৬/২০০০)। পাকিস্তান আমলে আমরা যে কাগজ নিয়ে গর্ব করে বলতাম ৬ আনার কাগজ ১০ আনায় কেন? অর্থাৎ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের তৈরি কাগজ পশ্চিম পাকিস্তানে ৬ আনা দিস্তায় বিক্রি হত। আর পূর্ব পাকিস্তানে সেই কাগজ বিক্রি হত ১০ আনা দিস্তা। এই বৈষম্য কেন হবে? আমাদের কাগজ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিল মেরে এনে এখানে বিক্রি হত চড়া দামে। সোনার বাংলা শশ্মান কেন এই লিফলেটে কথাগুলো লেখা হয়েছিল। সেই সময় আওয়ামীলীগ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য নিয়ে তুমুল আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তারা বলেছিল আমরা ক্ষমতায় আসলে ৮ আনা সের দরে চাল, ৬ আনা কাগজের দিস্তা, ২·৫০ টাকা সের দরে সরিষার তেল, ১০ আনা সের দরে চিনি দিব। এ ধরনের আরো অনেক পণ্য সামগ্রির কথা লেখা ছিল ঐ লিফলেটে। মূলত ঐ লিফলেট ছিল আওয়ামীলীগের রাজনৈতিক অঙ্গীকার নামা। সোনার বাংলা শ্মশান কেন এবং ৬ দফার মেন্ডেড বাস্তবায়নের কথা বলে দেশ স্বাধীন করা হলো। ক্ষমতায় আসলো আওয়ামীলীগ। জাতির দুর্ভাগ্য বলতে হয় শুধু একটি পতাকা, একটি ভূখণ্ড ছাড়া আর কিছুই জাতি পায়নি। পিণ্ডির শোষণ এখন দিল্লীর শোষণের রূপ নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি ৫০ লক্ষ লোক যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের বাজারে রূপ নিয়েছিল ঠিক তেমনি আজ ১২ কোটি ৫৬ লক্ষ লোক দিল্লীর বাজারে পরিণত হয়েছে। দুর্ভাগ্য বলতে হয় যেই কাগজ নিয়ে এতো গর্ব করতাম—সেই কাগজ এখন ভারত ও চীন থেকে আমদানি করতে হয়। কাগজেও আমরা স্বনির্ভরতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছি।

পত্রিকায় উঠেছে (যুগান্তর ২৪/৫/২০০০) জোকের মতো শুষে খেয়ে ফেলা হয়েছে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের রক্তমাংস। ১৯৫৯ সালে চালু হয়েছিল এই মিলটি। স্বাধীনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এবং স্বাধীনের পরেও কিছুদিন এর অবস্থা ভাল ছিলো। বর্তমানে প্রতি বছর লোকসান দিচ্ছে ৬০ কোটি টাকা। এই মিলটির ঋণের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা। উৎপাদনের লক্ষমাত্রা ছিল ৩০ হাজার মেট্রিক টন। উৎপাদন হয়েছে—১৬ হাজার মেট্রিক টন। উৎপাদন নেই, আয়ও নেই কিন্তু ২৪০০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেয়া হচ্ছে ৭৫ লক্ষ টাকা। প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকা লোকসান, ৭১ কোটি টাকা দেনা আর ১৮ কোটি টাকা ঋণের বোঝা নিয়ে চলছে মিলটি। সি, বি এর নেতার ৭২ জনই কাজ করে না। কিন্তু Overtime নেয়। নেয় ভ্রমণ ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। কর্মকর্তারাও সেই একইভাবে আয় করে নিচ্ছে। উৎপাদন কম—কিন্তু Overtime বেশি।

এই মিলের সাথে ৩০-৪০ লাখ লোকের ভাগ্য জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে। শ্লোগান উঠছে খুলনাবাসীদের থেকে "নিউজপ্রিন্ট মিলটি বাঁচান"। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ এখন

www.pathagar.com

ভারতীয় গাড়ি মেরামত কারখানার মজুরালয় রূপ নিয়েছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে আমাদের শিল্প কারখানাগুলোকে রিপিয়ারিং সেন্টারে পরিণত করতে পারি না। বিদেশী নিত্য নতুন মডেলের গাড়ি আসবে—ভোক্তারা গাড়িগুলো কিনবে, টাকাগুলো চলে যাবে বিদেশী কোম্পানিদের পকেটে। শুল্ক মুক্ত বিদেশী পণ্য একচেটিয়া বাজার দখল, স্বল্প মূল্যে সেসমস্ত পণ্য বিক্রি হলেও ক্ষতিকর দেশের অর্থনীতির জন্য। মুনাফা ছাড়া ভারত বা ইউরোপের কোন মালিক এখানে পণ্য বাজারজাত করবে না। মুক্ত বাজার অর্থনীতি অর্থাৎ বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতায় স্বদেশি পণ্য টিকে থাকার অবস্থা এখনও আমাদের তৈরি হয়নি। মানসিক ভাবেও নয় এবং ব্যবসায়িক ভাবেও আমরা এখনো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধারে কাছেও যেতে পারিনি। তাদের দেশপ্রেম, উৎপাদনে লেটেস্ট প্রযুক্তির ব্যবহার এগুলো এখনও আমরা আয়ত্ত করতে পারিনি। উন্নয়নশীল সমকক্ষ দু'টো দেশের সাথে মুক্ত বাজার অর্থনীতি চালু হতে পারে। সবল আর দুর্বলের মধ্যে এই বাজার অর্থনীতি চালু হলে সবল গিলে ফেলবে দুর্বলকে আর দু'টোই যদি সমান সমান হয় তখন প্রতিযোগিতা হবে ভাল আর মন্দের।

সম্প্রতি লন্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকায় লিখেছে—বিপুল বাজেট ঘাটতি থাকলে কোন দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। পাকিস্তান, ভারত ও ফিলিপাইনে এই সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশে এই সমস্যা আরও প্রকট। আমাদের দেশে রাজস্ব আদায় গত ৩ বছরে (১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০০) একই জায়গায় অবস্থান করছে। বিস্ময়কর ব্যাপার যে ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক সরকার সৎ করদাতাদের জরিমানা করার মতো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না। দুঃখজনক যে আমাদের দেশের বর্তমান বাজেট ব্যবস্থায় সৎ করদাতারা শতকরা ৩০ ভাগ কর দেবে আর অসৎ লোকদের কর দিতে হবে মাত্র ১০ শতাংশ। যে দেশে যত বেশি স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন হয় সে দেশ ততবেশি ব্যর্থ বলে আন্তর্জাতিকভাবে গণ্য করা হয়। বিগত সাড়ে চার বছর (৯৬-২০০০) স্থানীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটেছে ১৯ বার যা স্বাধীনের পর রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। চলতি অর্থ বছরের মার্চ ২০০০ পর্যন্ত মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মান ৪·৯ ভাগ অবমূল্যায়ন ঘটে। ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে দেশে জীবন যাত্রার ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ৪·৮ ভাগ। অপরদিকে টাকার মান কমেছে ৪·৯ শতাংশ (তথ্যসূত্র বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০০)। এ সময় জাতীয় উৎপাদনে গড় প্রবৃদ্ধিও বাড়েনি। সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে হলে আমাদের কৃষি ও শিল্পের দু'পায়ে হাঁটা শিখতে হবে।

বিগত সারে চার বছরে মুদ্রার ১৯-তম অবমূল্যায়নের ফলে এ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেছে ২০০০ কোটি টাকা। ডিভ্যালুয়েশেন পাট, চা, চামড়াও চাউলের পতন ঠেকাতে পারেনি। অবিশ্বাস্য হলেও কথাটি বিশ্বাস করতে হবে যে অন্ধকার বাণিজ্যের ক্ষুধা মিটানোর জন্যই টাকার এই বিশাল অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে। আগস্ট ২০০০

www.pathagar.com

পর্যন্ত টাকার ১৯ বার কাচি চালানোর পর হয়তো দু'চার জন ধনী ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়েছে বটে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ কারণ অধিক মূল্যে তাদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্য কিনতে হবে (সূত্র ঃ দৈঃ ইনকিলাব ১৫/৮/২০০০, যায় যায় দিন ১৫/৮/২০০০)। পরিশেষে বলবো—রাজস্ব ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় যে বিশৃঙ্খলা চলছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী ২০০৫ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ নিবে। বিশেষ করে মুদ্রাস্ফিতি আরও বেড়ে যাবে। সুদের বোঝা বাড়বে। দেশের গোটা অর্থ ব্যবস্থা ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়বে। আমাদের অর্থনীতির ব্যাপারে তাই আমরা এখনো আশ্বস্ত হতে পারছিনা।

সার্কভুক্ত দেশের জিডিপির অংশ হিসেবে কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ—

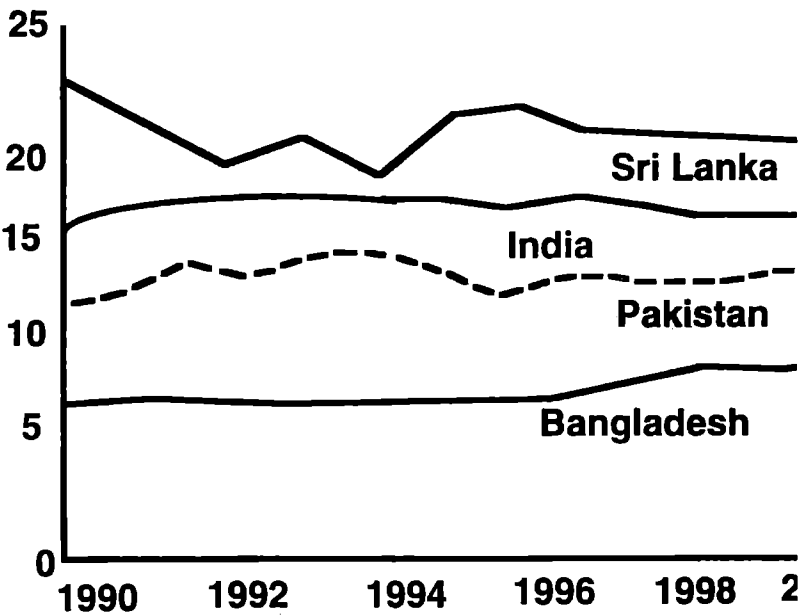

চারটি দেশে জিডিপির অংশ হিসেবে কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধির হার

www.pathagar.com

বস্ত্র ও পোশাক শিল্প ধ্বংসের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র

দেশ স্বাধীনের পর পাট শিল্পকে যেভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল সেই একই কায়দায় বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে ধ্বংস করার আন্তর্জাতিক চক্রান্ত শুরু হয়েছে বিগত এক দশক থেকে। গার্মেন্টসে শিশু শ্রমিক নিয়োগ বন্ধের নামে, আবার ইসি দেশসমূহে জি এস পি সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে, ইসিকে সার্ক কিউমিল্যাশনের সম্মতি পত্র দিয়ে এবং পরিশেষে পোশাক শিল্পে আগুন লাগিয়ে এই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ অনুন্নত দেশে রফতানি বৃদ্ধির স্বার্থে স্থায়ী কাঁচামাল থেকে উৎপাদিত কাঁচামাল রফতানির ক্ষেত্রে জিএস পি সুবিধা প্রদান করে আসছেন। এতদিন পর্যন্ত আমাদের তৈরি পোশাক শিল্পের মালিকগণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বস্ত্র থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ইইসি অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহে জিএস পি সুবিধা পেয়ে আসছে। এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য সার্ক কিউমিলেশন নামে ইসিভূক্ত দেশসমূহে জিএসপি (জেনারালাইসড সিস্টেম অব প্রেফারেন্স ফ্যাসিলিটিজ) সুবিধা প্রদানের তদবির করছে ভারত। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের রফতানি বাজার নিজেদের দখলে নেয়ার জন্যই ভারত মরিয়া হয়ে উঠেছে। ভারত সম্প্রতি ইসির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক প্রভাব খাটিয়ে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ থেকে আমদানিকৃত কাঁচামাল হতে রফতানিকৃত পোশাকের ক্ষেত্রে জি এস পি সুবিধা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ভারত জানে যে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে রফতানি করতে হলে ভারতই হবে একমাত্র রফতানিকারক দেশ।

২০ জুলাই ২০০০ ডেইলি স্টার এ–Dhaka Agrees to EC's new GSP Rule–এই হেডিংয়ে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করে Bangladesh has reportedly agreed to a European Commission (EC) provision that provides for entitlement of goods made with raw materials form any SAARC country to the Generalised System of Preference (GSP) Facilities. A commerce Ministry official wrote a letter to the SAARC secretarial giving Bangladesh's consent to the provision. The SAARC secretarial communicated it to the EC headquarters. এরই আলোকে ১ অক্টোবর ২০০০ থেকে ইউএস ট্রেড এ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যাক্ট ২০০০ ইসি দেশগুলোর জন্য সার্ক কিউমুলেশন কার্যকর শুরু হয়েছে। কার্যকরী হওয়ার ফলেই বাংলাদেশ গার্মেন্টস শিল্প মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

www.pathagar.com

এ ছাড়া দেশ জুড়ে গড়ে উঠা ৫ লক্ষাধিক বস্ত্র ব্যবসায় জড়িত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অস্তিত্ব ধ্বংসের নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এ দু'টি শিল্প খাতের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই সরকারের কাছ থেকে শতকরা ২৫ ভাগ আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছিল দীর্ঘদিন যাবত যাতে রফতানীমুখী পোশাক শিল্পে দেশীয় কাপড় ব্যবহার বৃদ্ধি করা যায় এবং উন্নতমানের পোশাক তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। পোশাক শিল্পের কাঁচামাল যদি স্থানীয় ভাবে বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে সরবরাহ করা যায় তাহলে বস্ত্র উৎপাদন নামক এই কাঁচামাল আমদানি বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন হয় বৈদেশিক মুদ্রায় সে বিশাল অংক বেঁচে যায়। বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প নামক এই দু'টি খাত বিগত এক দশক ধরে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছিল, দুঃখজনক যে এদু'টি খাত ভবিষ্যতে যাতে ২৫ শতাংশ করে আর্থিক সহায়তা না পায় সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে একটি স্বার্থান্বেষী মহল ভীষণ তৎপর।

তুলা আমদানি করতে শুল্ক লাগে না কিন্তু বিদেশী সুতা আমদানিতে ৪০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করে মূলত স্থানীয় সূতা উৎপাদনকারী শিল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বার্থ নিশ্চিত করা হয়েছে। পোশাক উৎপাদনকারী ও বস্ত্র উৎপাদনকারী এ দু'টো ভিন্ন খাত। কেউ পোশাক তৈরির জন্য বস্ত্র উৎপাদন করে, কেউ আবার বস্ত্র উৎপাদনের জন্য সুতা উৎপাদন করে। সর্বশেষ প্রক্রিয়াটি হলো বস্ত্র দিয়ে তৈরি করা হয় পোশাক। সেই পোশাক অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়তা করে। এদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও একের সাথে অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এতো কিছু অবগত থাকার পরও বিশেষ একটি স্বার্থান্বেষী মহল বিদেশি যোগ সাজসে বস্ত্র শিল্পের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত রয়েছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন কাগজে উঠেছে–যে স্বার্থান্বেষী মহলটি অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কৌশলগতভাবে বুঝাচ্ছেন যে, স্থানীয় সুতো উৎপাদকদের কাছ থেকে নয় বরং এলসির মাধ্যমে বিদেশ থেকে সুতো আমদানি করার জন্য। বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী ৩ লাখ টাকার সুতো খোলা বাজার থেকে ক্রয় করা যাবে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহলটি এই নিয়ম পরিবর্তন করে এলসির মাধ্যমে সুতো ক্রয় বাধ্যতামূলক করার জন্য মন্ত্রণালয়ে তদবীর করছেন। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো-ইদানীং ভারত থেকে চোরাই পথে আসা প্রচুর সুতো খোলা বাজারে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে। দেশে উৎপাদিত সুতো, বস্ত্র মালিকরা খরিদ করছে না, সস্তায় কিনছে সীমান্তের ওপার থেকে আসা সুতো। এতে স্থানীয় ভাবে গড়ে উঠা সুতার মিলগুলো প্রচণ্ডভাবে মার খাচ্ছে। কিন্তু প্রশ্নটা দাঁড়িয়েছে এলসির মাধ্যমে সুতো আমদানি করে বস্ত্র তৈরি করতে প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। এতোদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব নয় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোর। এর মূল কারণ হলো গার্মেন্টস কোম্পাণীগুলো সাধারণত ৯০ দিনের জন্য এলসি পেয়ে থাকে। এই সময়ের মধ্যেই তাদের পোশাক রফতানি করতে হয়। স্থানীয়ভাবে বস্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পের পক্ষে এলসির মাধ্যমে সুতো আমদানি করে তা দিয়ে বস্ত্র উৎপাদন করে আবার সেই বস্ত্র গার্মেন্টসে সরবরাহ করতে ৯০ দিনের চেয়েও বেশি সময় লেগে যায়। এছাড়া তাদের আর্থিক সংগতি কম থাকার কারণে এক সাথে ৩/৪ 'শ কেজির বেশি সুতো

www.pathagar.com

কিনতে পারেন না। সুতো আমদানিতে ৪০% আমদানি শুল্কসহ বহু টাকা খরচও পড়ে যায়। এ সমস্ত কারণে তারা অভ্যন্তরীণভাবে সুতো সংগ্রহের পক্ষপাতি। একটি স্বার্থান্বেষী মহল এটা চাচ্ছে না বিধায় সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে ৯০ দিনের চেয়ে বেশি সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করাও গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ক্ষতিকর। কারণ তাহলে তাদের শিপমেন্ট অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। নানাবিধ কারণেই পোশাক শিল্পগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তৈরি পোশাক রফতানির জন্য গার্মেন্টস কাপড় আমদানির অর্ডার দিবে কম্পোজিট টেক্সটাইল মিলে। ফলে বেকার হয়ে যাবে উল্লেখিত দু'টি শিল্পখাতে কর্মরত ১৫ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী যারা স্থানীয়ভাবে বস্ত্র উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ৭৬-৭৭ অর্থ বছর থেকে। মাত্র ০·০০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রফতানির মধ্য দিয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৯০-৯১ অর্থ বছরে এসে ৮৮৬·৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নিত হয়। তৈরি পোশাকের এই অগ্রযাত্রাকে আমাদের অনেক প্রতিবেশী দেশ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। দেশ স্বাধীনের পর মাত্র ৮টি পোশাক শিল্প নিয়ে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল, ১৯৯২ এসে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ১ হাজার ৪শত ৫টি। বর্তমানে গার্মেন্টস শিল্পের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার এর মত। কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ। বিগত সরকারের আমলে পোশাক শিল্পের উত্তরণ ঘটে সবচেয়ে বেশি। এ সময় প্রায় ১ হাজার ৫শ'র মত নতুন পোশাক শিল্পের সৃষ্টি হয়। দুঃখজনক যে জেগে উঠা পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ ক্রমান্বয়ে অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতদিন ধরে আমাদের পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ শতাংশ রফতানি হতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। চলতি সনে (২০০০) এর পরিমাণ ৫৩ থেকে ৫৫ শতাংশ উত্তীর্ণ হওয়ার কথা। সেই আশায় চির ধরেছে বলে মনে হয়। ১৯ মে, ২০০০ ইউএস ট্রেড এ্যাণ্ড ডেভলপম্যান্ট এ্যাক্ট ২০০০–এই নামে একটি আইনের আওতায় আমেরিকার আশীর্বাদপুষ্ট সার্ব-সাহারা আফ্রিকা ও ক্যারিবিয়ানের ৭২ টি দেশ শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা নিয়ে অতিসত্ত্বর মার্কিন বস্ত্র বাজারে প্রবেশ করবে। এর ফলে মার্কিন বস্ত্র বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক একচেটিয়া দখলের যে সুযোগ ছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। অসম প্রতিযোগিতায় পড়তে হবে বাংলাদেশকে। মোট কথা ২০০৪ সালের পর চীনসহ অন্যসব পোশাক রপ্তানিকারক দেশের সাথে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। এই ক্ষেত্রে টিকে থাকাটা হবে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে ঢাকার গার্মেন্টস নির্মাতা ও প্রশাসনের মধ্যে ন্যূনতম সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে, বাকিটা আসে হিমায়িত মৎস্য ও জনশক্তি রপ্তানি করে। সেই পোশাক শিল্পে আগামী এক বছরের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আগাম হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন পোশাক শিল্প সংগঠনের সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা। তিনি ২০-০৫-২০০০ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরে এসে ২২-০৫-২০০০ তারিখে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, বিল ক্লিন্টন সার্ব-সাহারা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের ৪৮ টি দেশের জন্য শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের

www.pathagar.com

সুবিধাদান সংক্রান্ত বিলে স্বাক্ষরদানের পর বাংলাদেশ অসুবিধায় পড়েছে। দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০ শোয়েটার কারখানায় বিপর্যয় শুরু হয়েছে। অন্যগুলোও অতিসত্বর বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

এদিকে আরেকটি ষড়যন্ত্র চলছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক সংগঠন এ, এফ, এল, সি, আই, ও থেকে। তারা বলেছে বাংলাদেশে ইপিজেডসমূহে ট্রেড ইউনিয়ন অতি সত্তর চালু করতে। এটা চালু হলে বাংলাদেশ ইপিজেডসমূহে আরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। বিপর্যয় আসবে রফতানি বাণিজ্যে। মার্কিন শ্রমিক নেতারা বলেছে বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে যদি ইপিজেডসমূহে শ্রমিক সংগঠন করতে দেয়া না হয়। সম্প্রতি জাপানি রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকার আলোচনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। তার মতে ইপিজেডে শ্রমিক সংগঠন ক্ষতিকর (সূত্র-দৈনিক প্রথম আলো-৩১-০৭-২০০০)।

তেল ও গ্যাস সেক্টরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যে সুবিধা দেয়া হয়েছে তার বিনিময়ে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ পাওয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে না যদি বিজিএমইএ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন থেকে বিষয়টির ব্যাপারে তৎপর ভূমিকা পালন করেন। প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সফরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সাথে ১৯/১০/২০০০ শীর্ষ বৈঠকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে বাংলাদেশে তৈরি পোশাকের কোটা ও শুল্কমুক্তভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানির অনুমতির বিষয়টিও আলোচিত হবে বলে জানা গেছে।

আমাদের বস্ত্র খাতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা প্রায় ১৫০ কোটি মিটার। তৈরি পোশাক শিল্পোখাতে বস্ত্রের চাহিদা প্রায় ২০০ কোটি মিটার। দেশীয় শিল্পের ক্ষেত্রে বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করতে পারে আনুমানিক ৩০ শতাংশ। আমাদের দেশীয় বস্ত্র খাত প্রায় ৬০ শতাংশ পোশাক শিল্পে চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। বস্ত্র খাতের এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি বিগত সরকারের বিশেষ প্রচেষ্টার কারণে সম্ভব হয়েছিল। এই ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। এই জন্য প্রয়োজন অতীতের মতো বর্তমান সরকারেরও বিশেষ সহযোগিতা, উদ্যোক্তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম অব্যাহত রাখা তাহলেই বস্ত্র খাত ধীরে ধীরে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে রফতানির ক্ষেত্রে আরও বেশি অবদান রাখতে পারবে।

আশুকরণীয় পদক্ষেপ

পোশাক ও বস্ত্র শিল্পকে রক্ষা করার জন্য যে সব পদক্ষেপ নিতে হবে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) বণিজ্য মন্ত্রণালয় বিগত নভেম্বর মাসে (১৯৯৯) ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত, লোভে বা চাপের মুখে যেভাবেই হোক না কেন ইউরোপিয়ান কমিশনকে (ইসি) Generalised System of Preference Facilities (G.S.P.) এর লক্ষ্যে সার্ক কিউমিলেসনের ব্যাপারে যে সম্মতিপত্র দিয়েছে তা অতিসত্বর স্থগিত করতে হবে-বস্ত্র শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে।

www.pathagar.com

(২) দেশের ও জাতীয় স্বার্থের বিরোধী জিএসপির নতুন নিয়মের প্রবর্তনরোধ কল্পে সরকারি উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল ব্রাসেলসে পাঠিয়ে তরিৎ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) চেম্বার অব কমার্স, বণিক সমিতি, বি,টি, এম, এ, ও বি, জি, এম এ সহ সকল ব্যবসায়ী মহল থেকে এ ধরনের একটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্তের (সার্ক কিউমিলেশন) বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

(৪) বস্ত্র খাতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে বাঁচানোর লক্ষ্যে ১৫ লাখ শ্রমিক কর্মচারীর স্বার্থে অবিলম্বে স্বার্থন্বেষী মহলের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৫) রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে দেশীয় কাপড় ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রদত্ত ২৫ শতাংশ হারে নগদ অর্থ সাহায্য চালু রাখতে হবে গড়ে ওঠা ৫ লক্ষাধিক বস্ত্র শিল্পের অস্তিত্বের স্বার্থে।

(৬) বিদেশ থেকে কাপড় আমদানি না করে সেই কাপড় দেশীয় বস্ত্র শিল্পগুলো থেকে খরিদ করতে হবে তাহলে বস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পে কর্মরত ১৫ লাখ শ্রমিক কর্মচারি এতে উপকৃত হবে। পাশাপাশি বস্ত্র শিল্প ধ্বংসের আন্তর্জাতিক চক্রান্ত নস্যাৎ হবে।

(৭) ভারত থেকে আসা অবৈধ উপায়ে সুতা বাজারে কেনা বেঁচা স্থানীয়ভাবে সুতা উৎপাদন কারীর স্বার্থে বন্ধ করতে হবে।

(৮) তৈরি পোশাক রপ্তানিতে ৩০ শতাংশ কোঠা বৃদ্ধিসহ বিনা শুল্কে বাংলাদেশী পণ্যের যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ-(মার্চে ২০০০ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের ঢাকা সফরের সময় বিষয়টির প্রধান্য দেয়া হয়েছিল) নিশ্চিত করতে হবে।

(৯) ৩০০০ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ১৫ লাখ কর্মী যাদের শ্রমের বিনিময়ে শিল্পটি রপ্তানিমুখী বাণিজ্যে রূপ নিয়েছে। তারা আজ কল্যাণমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাইরে জীবন অতিবাহিত করছে। স্বাস্থ্যগত উপায়ে দূর্ঘটনামুক্ত জোন হিসেবে এই শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে।

(১০) পোশাক শিল্পে ধ্বংসের কাজে কিছুদিন পর পর ষড়যন্ত্রমূলক যে আগুন লাগানো হচ্ছে–সে ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। তাহলেই পোশাক এবং বস্ত্রশিল্প আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হতে পারবে এবং পাশাপাশি বহির্বিশ্বে পোশাক রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে।

www.pathagar.com

বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাত সংস্কার প্রয়োজন

ব্যাংক, বীমা, পুঁজি বাজার, জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো, আইসিবিসহ (ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ) দেশের সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তোলার কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি কল্যাণমুখি রাষ্ট্র গঠনের সবধরনের কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে দেশে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। ব্যাংকে জনগণের গচ্ছিত টাকা অর্থাৎ আমানতকারীদের কষ্টার্জিত অর্থ সরকার ঋণ হিসেবে উত্তোলন করে দেশ পরিচালনায় ব্যয় করবেন এটা বিচক্ষণ ও দক্ষ সরকারের পরিচয় হতে পারে না। জনগণ তার কষ্টার্জিত মূলধন লোকসানী খাতে ব্যয় মিটানোর জন্যে নয় বরং লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকে জমা রেখেছেন। জনগণের টাকা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করার অর্থ হলো, সেখান থেকে কোন Return আসবে না–উল্টো রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পাবে যা জনগণকেই বহন করতে হবে। বর্তমান হাসিনা সরকার ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণে অতীতের সরকারের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন বিগত সাড়ে চার বছরে। আওয়ামীলীগ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। সরকারের অভ্যন্তরীণ অর্থায়নে ব্যাংক ঋণের পরিমাণ ৫০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে যা দেশের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার পরিচালনা তথা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দেয়ার জন্য ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের অর্থ ঋণ হিসেবে নেয়ার মধ্যে কোন প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায় না। সরকার বলেছেন–এ ঋণ তারা শোধ করে দিবেন। কিন্তু কিভাবে শোধ করে দিবেন তা স্পষ্ট করে বলেন নি। আমরা জানি ঋণ শোধ করতে হলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে হয়, কিন্তু ২০০০–২০০১ সালের বাজেটে সে সুযোগ রাখা হয়নি। পৃথিবীর সকল দেশে আমানতকারীদের অর্থ ব্যয় হয় উৎপাদনশীল খাতে। কিন্তু আমাদের দেশে সেই টাকা বেশির ভাগ ব্যয় হয় অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে (Non Trading Concern)।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে যে বাংলাদেশ তার বাজেটের ঘাটতি মিটানোর জন্য ব্যাংক ঋণের টাকা সরকারের নির্ভরশীলতা মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দিতে পারে। আইএমএফ বলেছে এতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের ওপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাবে এবং মূল্য স্ফীতির হার উর্দ্ধমুখী হবে। ৮ জুন ২০০০ জাতীয় সংসদে বাজেট পেশকালে এই তথ্য সংসদে বলেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী আব্দুল জলিল। (সূত্র ঃ দৈঃ জনকণ্ঠ সংসদীয় রিপোর্ট-২২/৬/২০০০)। সরকার ইতিমধ্যেই (আগস্ট ২০০০ পর্যন্ত) মুদ্রার ১৭–তম অবমূল্যায়ণ ঘটিয়েছে। ক্রয়মূল্য এখন ৫৪ টাকায় দাঁড়িয়েছে, বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে তখন ডলারের দাম ছিল ৩৬ টাকা, ক্ষমতা

www.pathagar.com

যখন ছাড়ে তখন ডলারের দাম ছিল ৪১ টাকা। আওয়ামীলীগ সরকার যখন আসে ক্ষমতায় তখন ডলারের দাম ছিল ৪২ টাকা। ১৫ আগস্ট ২০০০ এ ডলারের দাম হয় ৫৪ টাকা। বিএনপির ৫ বছরে টাকার দাম কমেছে (৪১-৩৬) =৫ টাকা এবং আওয়ামী লীগের ৪ বছরে টাকার দাম কমেছে (৫৪-৪২)=১২ টাকা

সম্প্রতি ব্যাংকারস ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ মতিঝিলের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বলেছেন–দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। তারা এ অবস্থার উত্তরণের লক্ষ্যে সহজভাবে ব্যাংকিং সেক্টরকে লাভজনক রাখার ব্যাপারে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন। তারা অর্থনীতির ইতিবাচক দিকগুলি চিহ্নিত করেছেন। ব্যাংকের মাধ্যমে তারা হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করার সুপারিশ করেছেন। হুণ্ডি ব্যবসার মাধ্যমে চোরাচালানের যে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকরী ভূমিকা অতিসত্বর পালন করা উচিত।

বর্তমানে দেশে ৯ টি সরকারি ব্যাংকসহ দেশী-বিদেশী মোট ৪৯ টি ব্যাংক কার্যক্রম চালাচ্ছে। আমাদের মতো ছোট দেশের অর্থনীতি কিভাবে এতগুলো ব্যাংক এফোর্ড করবে সেটাই ভাববার বিষয়। এ কারণে ব্যাংকিং সেক্টরগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ম বহির্ভূত কাজ চলছে। আমানতকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য ব্যাংকের সুদের হার ৭ শতাংশেরও বেশি হারে অর্থাৎ ১০ শতাংশ হারে আমানতের সুদ প্রদান করেছে। ব্যাংক রেইটের বেশি হারে আমানতের ওপর সুদ দেয়ার নজির সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অন্যদিকে ব্যাংকসমূহ ঋণগ্রহীতাদের ওপর ১৬ শতাংশ হারে সুদ আরোপ করছে। ব্যাংক রেইট যেখানে ৭ শতাংশ সেখানে ব্যাংকের অপারেশনাল কষ্ট যোগ করে ঋণের ওপর সর্বোচ্চ সুদের হার হওয়া উচিত ছিলো ১২ শতাংশ।

ব্যাংক ঋণের ক্ষেত্রে সুদ হ্রাসের দাবীটি বহুদিনের। কিন্তু ব্যাংকগুলি খেলাপি ঋণের ভারে আক্রান্ত থাকার কারণে কর্তৃপক্ষ তা কমাতে অস্বীকৃতি জানায়। বর্তমানে দেশের ব্যাংকগুলো মোট শতকরা ৪০ ভাগ খেলাপি ঋণের ভারে জর্জরিত বিধায় ঋণ প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু সেই সুযোগে সরকার ব্যাংকে পড়ে থাকা অলস টাকা ঋণ হিসেবে তুলে নেয়। প্রচলিত ব্যাংকিং নিয়মে ব্যাংক চড়া সুদে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের ঋণ দিয়ে ব্যাংকের লভ্যাংশ বৃদ্ধি করে কিন্তু সম্প্রতি ব্যাংকের সেই নিয়মে কিছুটা শীতলতা লক্ষ্য করা যায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ব্যাংকিং খাত অতি তারল্য সংকটে ভোগে।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান প্রফেসর রেহমান সোবহান সম্প্রতি জুন মাসের ২০০০ সাল তার এক লেখায় বলেছেন সরকার ব্যাংক থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছে সেজন্য বাজেটে অতিরিক্ত কর বসানো হয়নি (২০০০-২০০১)। ঋণের উপর সুদের এই ঘাটতি সরকার তাহলে বিভাবে পুরণ করবে এই প্রশ্ন এসে যায়। সরকার নির্বাচনকে সামনে রেখে এই কাজটি করেছেন বটে কিন্তু কাজটি সরকারের জন্য শুভ হবে না। আওয়ামী লীগ যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসে তাহলে সেই বেশি বিপদে পড়বে। কর বৃদ্ধির পরিবর্তে ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত সরকারকে নাজুক অবস্থায় ফেলে দিবে। এটা আওয়ামী লীগের জন্য বিজ্ঞচিত সিদ্ধান্ত নয়।

www.pathagar.com

অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা আরও বলেছেন, ব্যাংকে অলস অর্থ কেন পড়ে থাকবে সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। বেসরকারি খাত কেন ঋণ গ্রহণ করছে না শুধু সরকারই ব্যাংকে অলস টাকা তুলে নিচ্ছে ঋণ হিসেবে এবং ব্যয় করছে অনুৎপাদনশীল খাতে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই অসম মনোভাব শুভ নয়। বেসরকারি খাত বিনিয়োগে কেন নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছে তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। হংকংভিত্তিক পলিটিক্যাল এণ্ড ইকোনমিক্যাল রিস্ক কনসালটেন্সী (পিইআরসি) পরিচালিত জরিপে দেখা যায় এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই শিল্প উদ্যোক্তাদের অনুকূল ব্যবস্থাপনার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এশিয়ার মধ্যে কেবল হংকং, জাপান ও সিঙ্গাপুরই পুঁজি বিনিয়োগের সুষ্ঠু ও অনুকূল ব্যবস্থাপনা রয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশে পুঁজি বিনিয়োগ নিরুৎসাহী করেছে কারণ রাজনীতিতে পারিবারিক সদস্যদের প্রভাব ও সরকারের অস্থিতিশীলতাকে এজন্য দায়ী করা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংক সুদের হার সবচেয়ে বেশি। এমন কি ব্যাংক রেট ও ঋণের সুদের পার্থক্য, আমানতের সুদ ও ঋণের সুদের পার্থক্য প্রতিবেশী দেশসমূহসহ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোর সুদের পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি। বাংলাদেশের ব্যাংক রেট ৭·০০ শতাংশ। গড় ঋণের সুদ ১৪·০০ শতাংশ। দু'টির মধ্যে পার্থক্য ৭·০০ শতাংশ। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে ব্যাংক রেট ৮·০০ শতাংশ। ঋণের সুদ ১২.৫০ শতাংশ। পার্থক্য ৪·৫০ শতাংশ। মালয়েশিয়াতে ভিন্ন রকম চেহারা, সেখানে ঋণের সুদ ব্যাংক রেট থেকেও কম। হংকং-এ ব্যাংক রেট ৭·০০ শতাংশ। ঋণের সুদ মাত্র ৮·৫৮ শতাংশ। দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য মাত্র ১·৫৮ শতাংশ। এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, বাংলাদেশে আমানতের সুদের হারের চেয়ে ঋণের সুদের হার যতটা বেশি এশিয়া অঞ্চলে আর কোন দেশে এমনটি দেখা যায় না। এজন্য বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কস্ট অব ক্যাপিটাল বেশি হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা।

বাংলাদেশের দু'টি সুদের হারের পার্থক্য ৫·৩৭ শতাংশ। ভারতের ৩·৫০ শতাংশ, শ্রীলংকা -৩·৫০ শতাংশ, থাইল্যাণ্ড ৩·৮ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৩·৪৬ শতাংশ, হংকং ৪·১৮ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ১·১৮ শতাংশ, চীন ২·৬ শতাংশ, আমেরিকায় ২·৫০ শতাংশ। অধিক সুদের হার বিনিয়োগ বিঘ্নিত করে অনেক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। সুদের হার কমলে পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিবেশ সুস্থ ও ইতিবাচক থাকলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ফলে উৎপাদন বাড়ে, কর্মসংস্থানও বাড়ে। এ কারণে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায় ফলে পণ্যের চাহিদা বাড়ে, পণ্যের চাহিদা বাড়লে ভোগ বাড়ে ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদনে মানুষ আরও উৎসাহিত হয়। এভাবেই একটি দেশের অর্থনীতির প্রাণ শক্তি ফিরে পায়। স্বভাবতই বিনিয়োগ ও উৎপাদন না বাড়লে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শত চেষ্টা করলেও আশানুরূপ হয় না। সুতরাং এক বাক্যে বলা যায় জাতীয় অর্থনীতিতে তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ব্যাংকের সুদের হারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে যেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যে সমস্ত দেশে সুদের হার কম সে সমস্ত দেশগুলোর

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের সাথে তুলনা করলে সহজেই আমাদের বিনিয়োগের দৈন্য দশা ফুটে উঠে। নিম্নে যার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ভারতে মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ তাদের জিডিপি-র ২৩ শতাংশ, শ্রীলংকায় ২৪ শতাংশ, থাইল্যাণ্ডে ৩৫ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৩২ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ৩১ শতাংশ, হংকং-এ ৩০ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়া ৩৫ শতাংশ, চীনে ৩৯ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ৩৭ শতাংশ। এ তুলনায় বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ জিডিপির মাত্র ২১ শতাংশ। বিনিয়োগ মাত্রার এই প্রভাব পড়েছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর। ১৯৯০-৯৮ সময়কালে এই দেশগুলির প্রবৃদ্ধি ছিল যেমন–ভারতে ৬·১, শ্রীলংকা ৫·৩, থাইল্যাণ্ডে ৭·৪, মালয়েশিয়া ৭·৭, ইন্দোনেশিয়া ৫·৮, হংকং ৮·৮ দক্ষিণকোরিয়া ৬·২, চীন ১১.১, সিঙ্গাপুর ৮·০ শতাংশ আর বাংলাদেশে ছিল মাত্র ৪·৮ শতাংশ। এখান থেকেই বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝা যায় আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কতটা পেছনে পড়ে আছি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর মত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে অবশ্যই অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ২০০০–২০০১ সালের অর্থ বছরের জন্য প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশ অর্জন করতে হলে অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ জিডিপির প্রায় ২৮ থেকে ৩০ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য ব্যাংকিং খাতকে সর্বপ্রথম সংস্কার করতে হবে। সুদের হার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর মত ব্যাংকিং দক্ষতা আমাদের বাড়াতে হবে এবং প্রত্যেকের তার কাজের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণে বিদেশী ব্যাংকগুলো উন্নতি লাভ করছে। সর্বশেষে একটি কথা বলে আজকের নিবন্ধের ইতি টানবো তা হলো শুধু সুদের হার কমালেই বিনিয়োগ বাড়বে এ কথা ঠিক নয়, পাশাপাশি বিদ্যুৎ, গ্যাস, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা যথার্থ করলে সুদের হার কমিয়েও বিনিয়োগের ফসল ঘরে তোলা যাবে।

বিশ্বের কয়েকটি দেশের আর্থিক খাতের চালচিত্র

দেশের নাম	ব্যাংক রেট	ঋণের সুদ হার	আমানতের সুদের হার	পার্থক্য ৩-৪	জিডিপির%	মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ গড় বৃদ্ধি %	গড় প্রবৃদ্ধি
সময়কাল	ডি-৯৯	ডি-৯৯	ডি-৯৯	-	৯৮	৯০-৯৮	৯০-৯৮
বাংলাদেশ	৭·০০	১৪·০০	৮·৬৩	৫·৩৭	২১	৭·০	৪·৮
ভারত	৮·০০	১২·৫০	-	-	২৩	৫·৯	৬·১
শ্রীলংকা	১৬·০০	৮·০০	১১·৫০	-৩·৫০	২৪	৫·৮	৫·৩
থাইল্যাণ্ড	৪·০০	৮·২৫	৪·২৫	৩·৮০	৩৫	৬·৫	৭·৪

www.pathagar.com

দেশের নাম	ব্যাংক রেট	ঋণের সুদ হার	আমানতের সুদের হার	পার্থক্য ৩-৪	জিডিপির%	মোট আভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ গড় বৃদ্ধি%	গড় প্রবৃদ্ধি
মালয়েশিয়া	৭.২৮ (৯৭)	৬·৭৯	৩·৩৩	৩·৪৬	৩২	১০·৮	৭·৭
ইন্দোনে-শিয়া	১৩·১৩	২২·৭৭	১৩·৩৭	৯·৪০	৩১	৮·৮	৫·৮
হংকং	৭·০০	৮·৫৮	৪·৪০	৪·১৮	৩০	৮·৯	৮·৮
দঃ কোরিয়া	৩·০০	৮·৮৩	৭·৬৫	১·১৮	৩৫	৬·৪	৬·২
চীন	৩·২৪	৮·৫০	২·২৫	২·৬০	৩৯	১৩·৪	১১·১
সিঙ্গাপুর	-	৫·৮০	১·৬৮	২·৮০	৩৭	৯·৮	৮·০
জাপান	০·৫০	২·১৩	০·১০	২·১০	৩২	০·২	১·৩
যুক্তরাষ্ট্র	৫·০০	৮·৫০	৬·০০	২·৫০	১৮	৫·৮	২·৯
যুক্তরাজ্য	-	৫·০০	৪·৪৫	১·৪৫	১৬	১·৪	২·২

* উৎস ঃ ২,৩ ও ৪ নং কলাম International Financial Statistics (January 2000). IMF প্রকাশনা ৫,৬ ও ৭ নং কলাম World Development Report 1999/2000. World Bank. প্রকাশনা।

www.pathagar.com

দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওরা আসলে কি করছে

দেশ স্বাধীনের পর থেকে বাংলাদেশের বেসরকারি সাহায্য সংস্থাসমূহ দেশের দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে তৎপর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে আসে ব্যবসার নামে অন্য দিকে বিদেশী এনজিও সংস্থাগুলো আসে এ দেশে সেবার নামে অর্থাৎ দরিদ্র মানুষগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তারা বাংলাদেশে আগমন করে। প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার পূর্বে একটু পিছনে ফিরে তাকানো দরকার।

১৫১৭ সনে খ্রিস্টান মিশনারীরা এ দেশে আসে ধর্ম প্রচারের নামে। কিছুদিন পর অর্থাৎ ১৬৩৩ খ্রিঃ ইংরেজ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পাণী" মোগল সম্রাট শাহ্জাহানের অনুমতি নিয়ে এ দেশে আসে। খৃষ্টানমিশনারীর সাক্ষাৎ জাত ভাই ছিল "এই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি"। এ অঞ্চলে তাদের আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত বর্ষের উন্নয়ন। শেষঅব্দি বাণিজ্য দণ্ড পরিণত হয় শাসন দণ্ডে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে ঘটনার সূত্রপাত ঘটে। অর্থাৎ তাদের বহুদিনের লালিত স্বপ্নের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন ঘটে ঐ দিন। স্থানীয় ইংরেজ দালাল মীর জাফর আলী খাঁ, জগৎ শেঠ, উমী চাঁদ, ঘষেটি বেগম, নদীয়ার মহা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তত্ত্বাবধানে ইংরেজরা এদেশে তাদের মিশন বাস্তবায়নে সুযোগ পেয়েছিল। তাদের মন্ত্রণা কক্ষ ছিল কাসিম বাজার কুঠির। এখানে বসেই তারা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা রচনা করতো। পরবর্তী ইতিহাস বড়ই করুন, বড়ই নিষ্ঠুর-সেই বিভীষিকাময় দুঃসহ ইতিহাসের ঘটনা আমরা অনেকেই জানি। সেই বিষাদময় পুরো ঘটনাবলি এখানে বর্ণনা করলে লেখা দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই বিষয়টি পুরো বর্ণনা না করে তার সার সংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করলাম এই জন্য যে, নিবন্ধের সাথে এর কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

যা হোক জাতির একটি অংশের মোনাফেকীর কারণে ১৯০ বছর পর্যন্ত ভারতবাসীকে নিষ্পেষিত ও নিগৃহীত হতে হয়েছে। ভারতবাসীর একটি অংশকে সাম্প্রদায়িকতার বলীর পাঠা হতে হয়েছিল এ সময়ে। জন্মের পর থেকে তারা শুধু জ্বলছিল। ইংরেজ বেনীয়াদের সাথে হিন্দু জমিদারদের যৌথ ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে টিকে থাকা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল মুসলমানদের জন্য। গোলামীর খাতা থেকে নিজেদের নাম কাটাতে তাদের সময় লেগেছিল প্রায় দু'শ বছর। এ সময় বহু রক্ত ঝরেছিল। নিষ্পাপ শিশুর আত্মহুতি, মা বোনের সম্ভ্রমহানী ও দেশপ্রেমিক বহু মানুষের আত্মত্যাগের বদৌলতে অবশেষে ১৯৪৭ সনের ১৪ ই আগস্ট আল্লাহ্তাআলার দরবারে মজলুমজনতার আকুল

www.pathagar.com

ফরিয়াদ কবুল হওয়ার কারণে মুসলমানদের জন্য পৃথক একটি আবাস ভূমি সৃষ্টির মাধ্যমে শত্রু শক্তি পরাজিত হয়। আজাদী পাগল মানুষ আজাদী পাওয়ার পরও অদ্যাবধি ষড়যন্ত্রকারীদের হাত থেকে তারা পুরো নিস্তার বা অব্যহতি লাভ করতে পারেনি।

ষড়যন্ত্র মাঝপথে কিছু দিনের জন্য থেমে থাকলেও ষাট দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তি ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাধে ভর করে এ অঞ্চলের খেটে খাওয়া গরিব মানুষগুলোর রক্ত মাংস শুষে নেয়ার মহাপরিকল্পনা নবউদ্যমে শুরু করে। ইংরেজ শাসন আমলে "নীলকর সাহেবগণ" নীল চাষ করে বিদেশে রপ্তানি করে স্থানীয় কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করেছিল। জোরপূর্বক খাজনা ও কর আদায় করে গরিব কৃষকদের নিঃস্ব করে দিয়েছিল। ঠিক একই কায়দায় এনজিওর ছদ্মবেশে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে মূলত তারা প্রভুশক্তি নীলকর সাহেবদের ভূমিকায় আজ অবতীর্ণ হয়েছেন। দুঃখজনক যে ১৯৭১ সনে ১৬ ডিসেম্বরের এক রক্তাক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সবচেয়ে অবহেলিত নিষ্পেষিত দরিদ্রক্লিষ্ট জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা লাভের পরেও শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে পারেনি জেগে ওঠা নব্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পাণীদের শোষণের কারণে।

এনজিও কি এবং এর উদ্দেশ্যই বা কি?

Non Goverment Organisation বাংলায় যার নাম বেসরকারি সাহায্য সংস্থা। দেশের দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এরা কাজ শুরু করে। বিশ্বময় এদের অবাধ বিচরণ। এদের গুরু খ্রিস্টান ও ইহুদি ধনকুবেরা। বর্তমান ব্রাহ্মণ্য শক্তিও এদের চলার পথের সাথী হয়েছে। তাদের নাটের গুরু বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও পশ্চিমা বিশ্ব। বাংলাদেশের গরিবীয় অবস্থা দূরীকরণের লক্ষ্যে এনজিওদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্দেশ্য দরিদ্র জনগণের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, শিক্ষার পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রশিক্ষণের অত্যাধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং গণশিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে নিরক্ষরতার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা, সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার বিজ্ঞান ভিত্তিক আমূল পরিবর্তন সাধন করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন। এদের মূল বৈশিষ্ট্যকে এভাবে ভাগ করা যায় (১) তারা সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, (২) প্রকৃতিতে বেসরকারি, (৩) উদ্দেশ্য অলাভজনক, (৪) এদের লক্ষ্য জনগণের কল্যাণে ও উন্নয়নে কর্মসূচি দেয়া। কিন্তু দেখা যায় প্রতি বছরই আমাদের দারিদ্র্য সীমা বেড়ে যাচ্ছে। বেকারত্ব কমছেনা। শিক্ষার মান বাড়ছেনা, দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছেনা।

দেশে এনজিওদের সংখ্যা কত?

বর্তমানে বাংলাদেশে ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার এনজিও রয়েছে। এদের মধ্যে বৃহদাকারে প্রায় ১৪০ থেকে ১৪৫ টি এনজিও সরাসরি বিদেশী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব পরিচালনায় রয়েছে ৩৪ টি এনজিও। এগুলোর মধ্যে ফ্রেণ্ডস অব বাংলাদেশ, গ্লোবাল-২০০, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, হাঙ্গার প্রজেক্ট,

www.pathagar.com

ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস, ইন্টারন্যাশনাল ভলান্টারী সার্ভিসেস, জে এইচ ইউ সেন্টার ফর কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম, খ্রিস্চিয়ান রিফরমড ওয়ার্ল্ড রিলিফ কমিটি, ফেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, চার্ডেস অব গড মিশন, ডেভিড লিভিংস্টোন ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ড কনসার্ন, ওয়ার্ল্ড মিশন প্রেয়ার লীগ, ওর্য়াল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে ব্রিটিশ এনজিও সংখ্যা ১৫ টি। এগুলোর মধ্যে ভলান্টারী সার্ভিস ওভারসীজ, সেভ দ্যা চিল্ড্রেন ফাণ্ড, স্যালভেশন আর্মি, অক্সফার্ম, লেপ্রসি মিশন, ফ্রেণ্ডস অব বাংলাদেশ, কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ব্যাপিস্ট মিশনারী সোসাইটি, এ্যাকশন এইড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অস্ট্রেলিয়ার ৭ টি এনজিও হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপিস্ট মিশন সোসাইটি, কমিউনিটি এইড এব্রড, রাইটস ফাস্ট দ্যা চাইল্ড, আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল, এস ও এস চিল্ড্রেন ভিলেজ, সেভ দ্যা চিল্ড্রেন ফাণ্ড, সোসাইটি ফর দোজ হু হ্যাণ্ডেলস।

এ ছাড়াও নরওয়ের ৫টি, জাপানের ৭ টি, কানাডার ৮টি, ফ্রান্সের ৫টি, সুইডেনের ৬টি, ডেনমার্কের ৩ টি, সুইজারল্যাণ্ডের ৩ টি, নেদারল্যাণ্ডের ৩ টি। এছাড়াও পশ্চিমা দেশগুলোর আরও অনেক এনজিও বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং নতুন নতুন এনজিও খুলছে প্রতিদিন। মুসলিম দেশের মাত্র ৮টি এনজিও সীমিতভাবে সমাজসেবামূলক কাজ করছে। সম্প্রতি ভারতেরও কয়েকটি এনজিও এখানে অফিস খুলে বসেছে।

২০ হাজার এনজিও একটি শক্তি। এরা চাইলে সরকারকে এখন ক্ষমতা থেকে নামাতে পারে আবার চাইলে ক্ষমতায় বসাতেও পারে। এই সমস্ত এনজিওগুলো কার স্বার্থে কাজ করছে? জাতীয় স্বার্থে নাকি অন্য কোন অপশক্তির পক্ষে কাজ করছে তাও খতিয়ে দেখতে হবে। এনজিওদের কার্যক্রম ব্যাপকতর হওয়ার কারণে ১৯৯০ সালে এনজিও ব্যুরো গঠিত হয়। প্রায় ৭ হাজার এনজিও উক্ত ব্যুরোর অনুমোদন লাভ করেছে।

এনজিওদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম

সেন্টার ফর কো-অপারেশন এণ্ড ট্রেনিং ইন এগ্রিকালচারাল ব্যাংকিং বাংলাদেশ ব্যাংক ও কৃষি ব্যাংক সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান (সিকটাব)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ১৯৯৪ সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংক, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, এনজিও ব্যুরো, ইউএসএইড, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মিলিয়ে প্রায় ৮০ জন বিশেষজ্ঞ অভিমত পেশ করেন যে বাণিজ্যিক ব্যাংক গরিবদের মাঝে সরাসরি কোন ঋণ দিবেন না। ব্যাংকগুলো প্রচলিত রেটে বিভিন্ন এনজিওদের ঋণ প্রদান করবে। এনজিওগুলো সেই ঋণ বাড়তি কিছু সুদসহ দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিতরণ করবে। গ্রামাঞ্চলে যাদের দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত ব্যাপক কর্মসূচি রয়েছে এবং যাদের কাজের ধরন উন্নতমানের কেবল তারাই ঋণ বিতরণের দায়িত্ব পাবেন। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওর উপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ যুক্তিযুক্ত হবে না। গরিবদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের উপর সুদ ধার্যের ক্ষেত্রে এনজিওগুলো স্বাধীনতা

www.pathagar.com

ভোগ করবে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তুলনামূলক অত্যন্ত সহজ শর্তে এনজিওগুলোকে ঋণ দেবে। কোন জামানত বা কোন কোলেটারেনের প্রয়োজন নেই। প্রচলিত ব্যাংক রেট থেকেও কম রেটে এনজিওদের ঋণ দেয়া হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ছিলো উল্লেখিত অভিমত। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর '৯৪ আন্তর্জাতিক সেমিনারে এ ধরনের একটি প্রস্তাব রাখা হয় সরকারের কাছে। সরকার গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চাঙ্গা করা এবং ব্যাংকে পড়ে থাকা অলস টাকাকে গতিশীল করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এ সম্পর্কিত কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সরকারের নীতিগত কোন বাধা নেই এ কথাও বলেছেন। সরকারের কথা হলো আমরা চাই সার্বজনীন উন্নয়ন ও দারিদ্র–বিমোচন।

এক জরিপে দেখা যায় দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি সাহায্য সংস্থা এনজিওর ভূমিকা শতকরা ৯ ভাগ বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের অগ্রগতির প্রক্রিয়ায় অবদান রাখার জন্য প্রয়োজন সৎ এবং জনহিতকর অরাজনৈতিক এনজিও। কিন্তু দেখা যায় ব্রাক, এডাব, প্রশিকা, আশা, কারিতাস ইত্যাদি এনজিও সংস্থাগুলো দেশের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন বলে অভিযোগ এসেছে। তাদের বিগত দিনের কর্মকাণ্ড তা প্রমাণও করেছে বহুবার। বিদেশি অর্থপুষ্ট এনজিও জাতীয় রাজনীতিতে বিভেদ সৃষ্টির প্রচুর অভিযোগ প্রতিদিন কাগজে বের হচ্ছে। এনজিওরা রাজনীতিতে জড়িত হয়ে দেশের সংহতি বিনষ্ট করছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও যশোরে এনিয়ে অনেক কিছু ঘটে গেছে। সরকার এনজিওদের ভয় পায় এ ধরনের কথাও পত্রিকায় উঠেছে। মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুবাদে অধিকাংশ এনজিও বাংলাদেশে উন্নয়নের নামে মহাজনী শোষণ শুরু করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এনজিওগুলো প্রচলিত রেটে অনেক ক্ষেত্রে কম রেটেও জামানতবিহীন ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু সেই ঋণ গরিবদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে চড়া সুদে।

এ প্রসঙ্গে ১৯৯৫ সনের ডিসেম্বর মাসে জাহাঙ্গীর নগর ভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের একটি গবেষণা রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দৈনিক মিল্লাত ২৯/১২/৯৫)। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ৮৭ জন ছাত্র-ছাত্রী কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে যে তথ্য পান তার সার সংক্ষেপ ছিল এরকম-দেশে গ্রামীণ ব্যাংকের শাখাগুলো তাদের ঘোষিত সুদের হারের চেয়ে অনেক বেশি সুদ নিচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের ঘোষিত সুদের হার ২২%। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুদ নিচ্ছে ৩৩·৮৭%। সুদের এই হার অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের চেয়ে অনেক বেশি। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সুদের হার ১২% এর মতো। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের সুদের হার ৩১·১৬% আবার কোথাও এই ইফেক্টিভ সুদের হার ৪৪% পর্যন্ত। রিপোর্টে আরও বলা হয় গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র বিমোচনের চেয়ে ঋণ বিতরণ আদায়ে বেশি সফলতা লাভ করেছে। গ্রামীণ ব্যাংক ০·৪ একরের নিচে যাদের জমি আছে এরকম মানুষকে (প্রধানত মহিলাদের) ঋণ দিয়ে থাকে। এই ব্যাংকের ঋণ আদায়ের হার ১০০%। সুদের উচ্চ হারের কারণে ঋণগ্রহীতাদের আয় বেড়েছে কিন্তু কাঠামোর তেমন কোন উন্নতি সাধন ঘটেনি। বর্ধিত

www.pathagar.com

ভোগবাদী চিন্তা ও বস্তুবাদী আদর্শ চাপিয়ে দেয়া। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দাতাগোষ্ঠীর পণ্য বিপনণে প্রসার ঘটিয়ে মুনাফা লুণ্ঠন করা। চাকরির ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া। পুঁজিবাদী বিশ্বের অনুগত একদল বিশ্বস্ত দালাল সৃষ্টি করা। যার মনমানসিকতায় থাকবে ভোগের, ত্যাগের নয়। অপসংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার। বিভিন্ন দল ও জাতির মধ্যে বিরোধ জিইয়ে রাখা। নারী স্বাধীনতা ও প্রগতির শ্লোগানের আড়ালে নারী–পুরুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে পুরো সমাজকে নৈরাজ্য ও ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দেয়া। নারী স্বাধীনতার নামে নারীকে ভোগের বস্তুতে পরিণত করা অর্থাৎ অবাধ যৌনাচারকে উৎসাহিত করে পরিবার প্রথার ভাঙ্গন সৃষ্টি করে সমাজকে পঙ্গুত্বে নিয়ে যাওয়াই এনজিওদের মূল লক্ষ্য।

কতিপয় অমানবিক দৃষ্টান্ত

কোন কোন ক্ষেত্রে এনজিওদের ঋণের সুদের হার ৩০% এরও বেশি এবং অধিকাংশ এনজিওর ঋণ আদায় পদ্ধতি অত্যন্ত অমানবিক। এমনও ঘটনা ঘটেছে যেখানে এনজিওর ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে ঋণগ্রহীতা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। অনেকে ঋণ পরিশোধের জন্য আরও বড় ধরনের ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েছে। মহিলারা সতিত্ব হারিয়েছে জেল খেটেছে ও নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এরা মুখে প্রচার করছে গরিবদের ঋণ দিয়ে গ্রামের টাউট মহাজনদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষা করা হচ্ছে। মূলত দেখা যায় এনজিওরাই মহাজনি সুদি কারবার খুলে বসেছে। তারা নিজেদের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নিয়ম মেনে চলছেন কিন্তু গরিবদের ঋণ দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আশা, প্রশিকা ও ব্রাক এখন চড়া সুদে ঋণ দিচ্ছে। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতে না পারায় অর্ধাহারে অনাহারে জীবন অতিবাহিত করছে অনেক গরিব মানুষ। পত্রিকায় এ ধরনের সংবাদ প্রতিদিন প্রকাশ হচ্ছে। এনজিওগুলোর উন্নয়নের নামে মহাজনী শোষন রোধ করতে না পারলে ব্রিটিশ আমলের মত এ অঞ্চলের গরিব মানুষ আরও গরিব হয়ে যাবে। নিজস্ব সংস্কৃতি, ইমান আকিদা, তথা ধর্মীয় অনুভূতি সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেশ অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হবে এবং বর্তমানে হচ্ছেও তাই। কতিপয় এনজিওরা নৈতিক মূল্যবোধ, দাম্পত্য জীবন এবং অর্থনৈতিক সুস্থতা সব কিছুই ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশ।

সিলেটে এনজিও 'তেরেসায়' কর্মরত মহিলা কর্মীর অবৈধভাবে গর্ভপাত ঘটানো হয়। দীর্ঘদিন ধরে এনজিওর দুই সহকর্মী দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল কর্মী নিকুলা ইয়াসমিন (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৫/০৮/৯৮)। এনজিওদের আরেকটি ধর্ষণজনিত চাঞ্চল্যকর সংবাদ ছিল এরকম–রংপুরের চার এনজিও কর্মকর্তা তাদের এক সহকর্মীকে জোরপূর্বক অফিস কক্ষে ধর্ষণ করেছে। দেবীগঞ্জে ৯ জন মহিলার ধর্ষণকারীর নায়ক ছিলেন এনজিও কর্মকর্তা আতাউর রহমান ও খলনায়িকা ছিলেন লায়লা বেগম (সূত্র ঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৭/০৮/৯৮)।

www.pathagar.com

এক শ্রেণীর এনজিও কুচক্রিদের এ ধরনের ধর্ষণজনিত সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকায় প্রকাশ হচ্ছে। কতিপয় বিদেশী এনজিও ঢাকায় পতিতাদের নিয়ে সম্মেলন করেছেন। এনজিওরা ভাড়া করা মুন্সি মৌলভী দিয়ে ফতোয়া দিয়ে উল্টো তারাই আবার প্রকৃত আলেম সমাজের ভাবমূর্তি বিনিষ্ট করার জন্য ফতোয়াবাজ আখ্যায়িত করে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে দিনাজপুর শহরের বিরল উপজেলার গড়বাড়ি, রাজুরিয়া, রাজরামপুর মৌজার বিভিন্ন লোকের প্রায় ১০৫ একর জমি এখন দখল করে নিয়েছে সিডিএ নামক একটি এনজিও। (সূত্র দৈঃ রূপালীদেশ ২১/১০/২০০০)

মৌলভী বাজার দৈঃ ইত্তেফাক সংবাদদাতা ২৫/৬/২০০০ কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে জানা যায় কমলগঞ্জ থানার হাটবাজারে বিভিন্ন এনজিও সংস্থার নিকট রক্ষিত আমানত আত্মসাতের হিড়িক পড়েছে। প্রতিদিনই একটা না একটা এনজিও সংস্থা আমানতকারীদের আমানত নিয়ে তল্পীতল্পা গুটিয়ে পালাচ্ছে। এনজিওগুলোর এ ধরনের আচরণে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। ২৯ মে ২০০০ কয়েকজন আমানতকারী কমলগঞ্জ থানার ভানুগাছ বাজারে রাসা নামক একটি এনজিও অফিসের কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামকে ঘেরাও করে তাদের আমানতের টাকা ফেরত দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। উপায়ন্তর না দেখে পরের দিন টাকা ফেরত দেয়ার কথা বলে অফিসে তালা লাগিয়ে সে পালিয়ে যায়।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞপ্তি আকারে কয়েকটি পত্রিকায় উঠেছে জি জি এন, আই টি সি এল, ও বি, সি, এম, সি লিমিটেড ইত্যাদি কয়েকটি কোম্পানি সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রচুর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। এর বিপক্ষে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবাদও উঠেছে। অর্থ আত্মসাত, হুণ্ডি ব্যবসা, চোরাচালান, শুল্ক ফাঁকি, বন্ধুরাষ্ট্রের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে আমরা মনে করি। এ সমস্ত ব্যাপারে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এটা আমরা প্রত্যাশা করি।

আসু করণীয় পদক্ষেপ

এনজিওদের তৎপরতা রোধকল্পে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সর্ব প্রথম। একটি আইন প্রণয়ন করতে হবে যাতে এনজিওরা দারিদ্র্য বিমোচনের নামে টাকা আত্মসাত ও টাকা পাচার করতে না পারে। জাতি গঠন ব্যতিরেকে যদি জাতি বিধ্বংসী কোন কার্যক্রমে জরিত থাকলে সাথে সাথে সেই সমস্ত এনজিওর অনুমোদনের সার্টিফিকেট বাতিল ঘোষণা করতে হবে। সুদের ব্যবসার মাধ্যমে গরিব মানুষদের শোষণের হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য সরকারকে গঠনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ধর্ম ও রাষ্ট্রদ্রোহী কোন কর্মকাণ্ডে জরিত থাকলে সাথে সাথে সেইসব এনজিওদের চিহ্নিত করতে হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ছাড়া জনগণকে এ ব্যাপারে অধিক সচেতন হতে হবে। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে মূলত নারী নির্যাতনের মাধ্যমে নারীর অধিকার খর্ব করার গুরু দায়িত্বে কোন এনজিও রয়েছে কিনা সেটাই এখন বিবেচ্য বিষয়। দেশে এনজিওদের প্রসারের সাথে সাথে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গর্ভপাত ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত অসৎ কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে তাদের ইন্ধন রয়েছে বলেও শোনা যায়। এ সমস্ত ব্যাপারে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দারিদ্র বিমোচন তারা কতদূর করতে পেরেছেন তারও একটি হিসাব দিতে হবে। সরকারের কাছে এনজিওদের কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। তারা দেশ ও জাতির উন্নয়নে কতটুকু অবদান রেখেছে তারও ব্যাখ্যা দিতে হবে বছর শেষে। নারী নির্যাতন বন্ধে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তারও ব্যাখ্যা দিতে হবে কারণ প্রকৃত অর্থে তারা সেবার নামে উন্নয়নের নামে উচ্ছৃঙ্খলতা রোধের নামে এদেশে এসেছেন। তাদের আগমনের পর থেকে এগুলো না কমে যদি বাড়তেই থাকে তাহলে এনজিওদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হবে। আর যদি তাদের কর্মকাণ্ড দেশের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ সার্বিক উন্নতি ঘটে তাহলে তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোন প্রশ্নই থাকবে না। এ কথাও সত্য যে গ্রামীণ ব্যাংকসহ অনেক এনজিও দেশের উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছেন। তবুও বলবো বর্তমানে দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের নামে যা ঘটছে উল্লেখিত আলোচনায় তার কিছু আলোকপাত করা হয়েছে তাতে দেশের অবস্থা সুখকর বলে মনে হয় না। ইন্দোনেশিয়াতে সমস্ত বিদেশী ঋণ ও সাহায্য সরকারের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এনজিওর অশুভ তৎপরতা সেখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এনজিওদের অশুভ তৎপরতার কারণে তারা পূর্বতীমুর হারিয়েছে আরও একটি প্রদেশ হাতছাড়া হওয়ার পথে। এনজিওগুলোর নিয়ন্ত্রণে শ্রীলংকার পার্লামেন্টে আইন পাস করা হয়েছে। আমাদেরও প্রয়োজন হলে দেশে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোন কর্মকাণ্ড ঘটার পূর্বেই সেরকম ব্যবস্থা নিতে হবে। এনজিওদের অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে এখনই সজাগ না হলে লর্ড ক্লাইভের ভূমিকায় একদিন তারা অবতীর্ণ হবে আর সেই দিন মনে হয় খুব বেশি দূরে নয়।

www.pathagar.com

জ্বালানি তেল, গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং টাকার অবমূল্যায়ন বোঝার ওপর শাকের আঁটি

২০০০-২০০১ অর্থ বছরে বাজেটে সরকার যে কাজটি থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে সস্তা বাহবা পাওয়ার প্রচেষ্টা করেছিলেন শেষঅব্দি তা ধরে রাখতে পারেননি। গত ১৪ আগস্ট ২০০০ সোমবার মন্ত্রিসভার এক জরুরি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তোঘলকি কায়দায় জ্বালানি তেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি মন্ত্রী বলেছেন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি ঘটার কারণে এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। সম্প্রতি টাকার ১৭-তম অবমূল্যায়নও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির আরেকটি কারণ বলে মন্ত্রণালয় থেকে উল্লেখ করা হয়।

অর্থমন্ত্রী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন বর্তমান টাকার অবমূল্যায়নের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে যে, মূলত মুদ্রার মূল্যমান সংশোধন করার জন্যই এটা করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের পণ্য বিশ্ব বাজারের প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে। এতে যেমন রপ্তানি বাড়বে, পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বাড়বে। রপ্তানিকারকরা তাদের পণ্যের দাম আগের চেয়ে বেশি পাবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এর আগেও ১৬ বার মুদ্রার অবমূল্যায়ন করেও রপ্তানির লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হয়নি। ব্যালেন্স অব ট্রেড সবসময় আমাদের প্রতিকূল ছিলো। টাকার অবমূল্যায়নের ব্যাপারে দেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদরা বলেছেন ভিন্ন কথা, তাদের মতে সরকার রাজস্ব আদায়ের ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের মজুদ কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেখানোর জন্যই কাজটি করেছেন, সাহায্য দাতাগোষ্ঠীর (আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, এডিবি) কৈফিয়ত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য। অন্যদিকে মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতার দায়ভার জাতির স্কন্ধে তুলে দিয়ে সরকার নিস্তার পেতে চেয়েছেন। সরকারের ব্যর্থতার কারণেই ধনী গরিব আপামর জনসাধারণ সবাই আজ গভীর সঙ্কটে নিমজ্জিত।

বিভিন্ন সূত্র থেকে যে জরিপ পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে গত এক দশকে বিভিন্ন খাতে জ্বালানি তেলের চাহিদা বৃদ্ধির অনুমতি হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

www.pathagar.com

কৃষি খাতে জ্বালানি তেলের ব্যবহার হয়েছে ১৮ শতাংশ, বিদ্যুতে ৯ শতাংশ, যোগাযোগ খাতে ৪৮ শতাংশ, শিল্পে ৮ শতাংশ এবং গৃহস্থালীতে ১৭ শতাংশ। আগামি ২০০৫ সাল নাগাদ যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে জ্বালানি তেলের মধ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাবে কিন্তু কেরোসিনের চাহিদা কিছুটা কমবে। দেশে মোট জ্বালানি তেলের মধ্যে ৫৬ শতাংশ ডিজেল, ১৮ শতাংশ কেরোসিন, ৯ শতাংশ পেট্রোল, বিমান জ্বালানি ৫ শতাংশ, ৬ শতাংশ ফার্নেশ অয়েল, অবশিষ্টাংশ অন্যান্য পেট্রোলিয়াম। দেশে ব্যবহারযোগ্য পুরো তেলটাই বিদেশ থেকে আমদানি করে আনতে হয় যার ৪০ শতাংশ অপরিশোধিত (ক্রুড অয়েল) আকারে এবং ৬০ শতাংশ পরিশোধিত হয়ে সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আসে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রাম পতেঙ্গার ইস্টান রিফাইনারীতে পরিশোধিত করা হয়। উল্লেখিত আলোকে দেখা যাচ্ছে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতির প্রতিটি খাতই আক্রান্ত হচ্ছে কমবেশি। এই খাতের সাথে কোন না কোনভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এদেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। সুতরাং তারাও আক্রান্ত হচ্ছে এই মূল্য বৃদ্ধির কারণে। ইউরোপের মতো তেল–গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে জনগণের রাস্তায় নামা উচিত ছিল। কিন্তু জনগণ কিছুই করেনি। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে ভারতের মন্ত্রী মমতাব্যানার্জী ও অজিত পাঞ্জা পদত্যাগের হুমকী দিয়েছেন। বাজপায়ী এ ব্যাপারে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেয়ায় পদত্যাগ ঐ দুই মন্ত্রী স্থগিত রেখেছেন। আমাদের ভারতের পার্থক্যটা এখানেই সরকার তেলের উপর ট্যাক্স কমিয়ে এ ব্যাপারটি দিয়ে ম্যানেজ করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি।

এক দশক পূর্বে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কি পরিমাণ ছিলো এবং বিগত অর্থ বছরে ১৯৯৯-২০০০ এর ব্যবহার কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তারই একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ ঃ

অর্থ বছর (৯০-৯১)	অর্থ বছর (৯৯-২০০০)
পেট্রোল-৯১ হাজার ৬ শ মেট্রিক টন	৩ লাখ ৬০ হাজার টন
ডিজেল-৭ লাখ ৯১ হাজার টন	১৯ লাখ টন
অকটেন ১৪ হাজার ৭ শ টন	১লাখ ২৫ হাজার টন
কেরোসিন-৪ লাখ ৬০ হাজার টন	৬ লাখ ৭০ হাজার টন

উল্লেখিত তথ্যের আলোকে দেখা যাচ্ছে–বিগত ১০ বছরে জ্বালানি তেলের ব্যবহার বেড়েছে তিনগুণ। আগামী ৫ বছরে ব্যবহার আরও তিনগুণ বাড়বে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্ব থেকে বিগত চার বছরে জ্বালানি তেলের লিটার প্রতি বর্ধিত মূল্যের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

www.pathagar.com

	১৯৯৬ প্রতি লিটারের মূল্য	১৯৯৭ প্রতি লিটারের মূল্য	২০০০ প্রতি লিটারের মূল্য	৪ বছরে মূল্য বৃদ্ধি
পেট্রোল	১৩ টাকা	২১ টাকা	২৩ টাকা	১০ টাকা
অকটেন	১৪ টাকা	২৩ টাকা	২৫ টাকা	১১ টাকা
ডিজেল	১৩ টাকা	১৫ টাকা	১৭ টাকা	৪ টাকা
কেরোসিন	১৩ টাকা	২২ টাকা	২৪ টাকা	১১ টাকা

অর্থাৎ দুই দফায় বর্তমান সরকার জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি করেছে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ।

জ্বালানি তেল আমদানি থেকে শুরু করে পরিশোধন, বিপণন এর পুরোটা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ৯৯-২০০০ অর্থ বছরে মোট লোকসান দিয়েছে প্রায় ১২ হাজার ৬ শ কোটি টাকা, বিগত অর্থ বছরে (৯৯-২০০০) জ্বালানি তেলের চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৩২ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। চলতি অর্থ বছরে (২০০০-২০০১) ৩৪ লাখ টন চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ দশ বছর পূর্বে এর চাহিদা ছিল ১২ লাখ টনের মতো। সুতরাং উল্লেখিত বিশ্লেষণে বুঝা যায় জ্বালানি তেলের ব্যবহার প্রতিদিন বাড়ছে এবং গোটা দেশের অর্থনীতির সাথে বিষয়টি জড়িত বিধায় মূল্য বৃদ্ধির পুরো চাপটা প্রত্যক্ষভাবে এ দেশের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরই বহন করতে হবে। সুতরাং তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে নিম্নরূপ যার কার্যকারিতা হবে ১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সাল থেকে।

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি

গ্যাসের চুলা	পূর্বের মূল্য	বর্তমান মূল্য ১লা সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে	মূল্য বৃদ্ধি
এক বার্নার চুলার মূল্য	১৮৫·০০	২১২·৭৫	২৭·৭৫ টাকা
দুই বার্নার চুলার মূল্য	২৯০·০০	৩৩৩·৫০	৪৩·৫০ টাকা

গ্যাসের মূল্য বেড়েছে পূর্বের তুলনায় শতকরা ১৫ ভাগ।

টাকার অবমূল্যায়ন

১৯৯১ সালে বিএনপি যখন ক্ষমতায় আসে তখন ডলারের মূল্য ছিল ৩৬ টাকা। বিএনপি যখন ক্ষমতা থেকে চলে যায় তখন ডলারের মূল্য ছিল ৪১ টাকা। বিগত ৫ বছরে (৯১-৯৬) অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের আমলে ২৩ বার টাকার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার দাম কমে ছিল মোট ৫ টাকা। অর্থাৎ ৫ বছরে ৫ টাকা, প্রতি বছরে ১ টাকা। আওয়ামীলীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন ডলারের দাম ছিল ৪২ টাকা। বর্তমানে (১৫ আগস্ট, ২০০০) ডলারের দাম হয়েছে ৫৪ টাকা। শোনা যায় ডিসেম্বরের মধ্যে

www.pathagar.com

ডলারের দাম ৬০ টাকায় উঠবে। বর্তমান অর্থমন্ত্রী এস, এ, এম, এস কিবরিয়া বিগত ৪ বছরে তার আমলে ১৭ বার অবমূল্যায়নের ফলে টাকার দাম কমেছিল মোট (৫৪-৪২) =১২ টাকা। ৪ বছরে ১২ টাকা অর্থাৎ প্রতি বছরে ৩ টাকা করে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে গিয়েছিল। অতীতের সাথে বর্তমানের পার্থক্যটা হল অতীতে অর্থনীতিকে সহ্য করার একটা সুযোগ দিয়ে ধীরে ধীরে টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। সারা বিশ্বে ডলারের বিপরীতে মুদ্রার মান এই নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কিন্তু বর্তমান সরকার খুব দ্রুতগতিতে ডলারের বিপরীতে টাকার অংকের পরিমাণ বাড়িয়ে অবমূল্যায়ন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান সরকার ১৯৯৮ সালে ৩ বার টাকার অবমূল্যায়ন করেছে। প্রথম বার ৮০ পয়সা দ্বিতীয় বার ৮০ পয়সা, তৃতীয় বার ১·৪০ টাকা। ১৯৯৯ সনে দুইবার টাকার অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল। প্রথমবার ১ টাকা, দ্বিতীয় বার ১·৫০ টাকা। সর্বশেষে ২০০০ সালের ১৫ আগস্ট এক লাফে ৩ টাকা অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ডলার ৫১ টাকা থেকে ৫৪ টাকা করা হয়েছিল। বিগত ৪ বছরে অবমূল্যায়নের ফলে টাকার দাম কমেছে শতকরা ৩২ ভাগ।

বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি

চলতি বছর ১ সেপ্টেম্বর থেকে বাড়বে বিদ্যুতের মূল্য। এ বছরে এটা হবে বিদ্যুৎ খাতে দ্বিতীয় বারের মত মূল্য বৃদ্ধি। বিশ্বব্যাংকের নির্দেশানুযায়ী প্রতি ৬ মাস অন্তর অন্তর প্রতি ইউনিট ০·৫ পয়সা করে বিদ্যুতের মূল্য বাড়ছে। ১ নভেম্বর, ২০০০ থেকে বিদ্যুৎ খাতে যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১থেকে ৩০০ ইউনিট পর্যন্ত = ২·১৫ টাকা।

৩০১ থেকে ৫০০ ইউনিট পর্যন্ত = ৩·৩৫ টাকা।

৫০১ থেকে ৭০০ ইউনিট পর্যন্ত = ৪·৭৫ টাকা।

৭০১ থেকে তদূর্দ্ধ ইউনিট পর্যন্ত = ৫·১৫ টাকা।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য ছিল ১·৬৫ টাকা। বিগত ৪ বছর পর এর মূল্য দাঁড়িয়েছে ২·১৫ টাকা। অর্থাৎ বিগত ৪ বছরে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের মূল্য বেড়েছে ০·৫০ টাকা। সেই হিসেবে বিদ্যুতের মূল্য বেড়েছে প্রায় শতকরা ৩৫ ভাগ।

মূল্য বৃদ্ধি ও টাকার অবমূল্যায়নের ফলে কৃষি ও শিল্পে-এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া

জ্বালানি তেল, গ্যাস এবং বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে মারাত্মক ধ্বস নামবে। জ্বালানির তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সরকারি ও বেসরকারি পরিবহণ খাত। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রুটের যাত্রী ভাড়া বেড়ে গেছে অনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

হারে। যশোরসহ উত্তর বঙ্গের বহু জায়গায় ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত ঘটনা নিয়ে যাত্রীদের সাথে পরিবহণ মালিক পক্ষের লোকদের হাঙ্গামা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ব্যাপারে পত্রিকায় লিড নিউজ হয়েছে। নগরীর হাজার হাজার মানুষ প্রতি দিন যাত্রী বাসে করে তাদের কর্মস্থলে যাওয়া-আসা করে। এখন থেকে যাতায়াত খাতে তাদের ব্যয় আগের চেয়ে বেড়ে যাবে। দুর্মূল্যের বাজারে তাদের জন্য এটা হবে অসহনীয় একটি বাড়তি চাপ। আমরা জানি যে, দেশের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্য জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে এই তিনটি জিনিস ছাড়া গোটা বিশ্ব বলতে গেলে প্রায় অচল। স্বভাবতই উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপাদান সমূহর দাম বেড়ে গেলে শিল্প পণ্যের দামও বেড়ে যায়। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে দেশের কৃষক সমাজ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ কৃষি সেচ কাজে এ দু'য়ের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুল্লেখ্য। কৃষি পণ্য উৎপাদনে এই মূল্য বৃদ্ধি কৃষকের জন্য বাড়তি চাপ হিসেবে দেখা দিবে। দেশে ৬৪ হাজার গ্রামগঞ্জের মানুষ এখনো গৃহের আলো ও রান্নার কাজে কেরোসিনের উপর নির্ভরশীল। গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ এখনো জ্বালানি কাজে কেরোসিন ব্যবহার করে। সুতরাং বিগত ৪ বছরে শুধু কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি ১১ থেকে ১২ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এটাও তাদের জন্য একটি বাড়তি চাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া জমিতে যে সার ব্যবহার হয়, সেই সারও এখন থেকে তাদের অতিরিক্ত মূল্যে কিনতে হবে। কারণ এই সার উৎপাদনেও তেল ও গ্যাসের প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেশের ফার্টিলাইজার কোম্পানিগুলো এক ধাপ বাড়িয়ে সারের বিক্রয় মূল্য ধার্য করবে। বর্তমান বিদ্যুতের মারাত্মক লোড শেডিং-এর কারণে এখন বড় বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, দোকান পাটে বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে ডিজেল পেট্রোল চালিত জেনারেটর ব্যবহার করছে। এক কথায় বলা যায়, জ্বালানি তেলের মূল্য বেড়ে যাওয়ার কারণে গোটা ব্যবসায়ী মহল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এক তথ্যে প্রকাশ প্রতি ঘণ্টায় লোডশেডিংয়ের ফলে দেশের অর্থনীতির ক্ষতি প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

টাকার অবমূল্যায়নে ক্ষতি

বার বার টাকার অবমূল্যায়নের মত হঠকারী নীতির কারণে শিল্প উদ্যোক্তারা সবচেয়ে বেশি নিরুৎসাহী হয়ে পড়েছে। কারণ মেশিন, যন্ত্রাংশ, উন্নত প্রযুক্তি এবং কাঁচামাল আমদানি করতে হচ্ছে প্রচুর চড়া দামে। ফলে আমদানি খরচও তাদের বেড়ে যাচ্ছে। আমদানিকৃত এ সমস্ত পণ্যসামগ্রী অধিক দামে খেটে খাওয়া মানুষদের কিনতে হচ্ছে। অন্যদিকে চোরাচালানীর মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য আসছে বিভিন্ন অরক্ষিত সীমান্ত পথে। শুল্ক-বিহীন এ সমস্ত পণ্য স্থানীয় বাজারে কমদামে বিক্রি হচ্ছে। এতে বাজার হারাচ্ছে স্বদেশি পণ্য। সুতরাং এক বাক্যে বলা যায় বার বার টাকার এই অবমূল্যায়ন দেশীয় শিল্প-কারখানা ধ্বংসের পথকেই প্রশস্ত করছে।

www.pathagar.com

কেন এই অবমূল্যায়ন

বর্তমান অর্থমন্ত্রী বলতে চাইছেন, টাকার অবমূল্যায়নের ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে। রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্যই কাজটি করা হয়েছে। আসল ব্যাপারটি হল বিগত ২৯ বছরে প্রায় অর্ধশতাধিক বার টাকার অবমূল্যায়ন করে 'ব্যালেন্স অব ট্রেড' আজও আমাদের অনুকূলে আনতে পারিনি। দুঃখজনক যে আমরা প্রতিবছরই বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের জন্য ভর্তুকী দিয়ে যাচ্ছি বিদেশি ঋণ গ্রহণ করে। আবার এই বিদেশি ঋণের সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে প্রতিবছর আমাদের ১ শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় হয়। দু'একজন ধনী ব্যবসায়ী এতে লাভবান হতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে এই অবমূল্যায়নের ফলে প্রাপ্তির খাতায় শূন্য, আর খরচের খাতায় বিরাট অংকের সৃষ্টি হবে।

১৬-০৮-২০০০ রাজধানীর একটি হোটেলে আমেরিকান চেম্বার কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় I.M.F.A. এর ঢাকা কান্ট্রি ডাইরেক্টর পি, হিকস এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে সম্প্রতি টাকার অবমূল্যায়নে বড় ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করতে পারে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (আইএমএফ) এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) বিগত সময়ে তাদের দেয়া অর্থের হিসাব চেয়েছে। কিভাবে টাকাগুলো ব্যয় করা হয়েছে তাও জানতে চেয়েছে। আকস্মিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পাওয়ার কারণ, বাজেটে ব্যাপক রাজস্ব ঘাটতির কারণ জানতে চেয়েছে। মূলত সরকার দাতাগোষ্ঠীর প্রেসারে আছেন। প্রতিবছর দাতাগোষ্ঠী কর্তৃক দেশের উন্নয়ন ও দরিদ্র বিমোচনের নামে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছে তার অধিকাংশই বিগত ৪ বছরে অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়েছে। ক্ষমতাসীন পরিবারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য কোটি কোটি টাকা অপচয় করা হয়েছে। এ সমস্ত কথা সাহায্যদাতাদের আর অজানা থাকছে না। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় সন্তোষজনক কারণ ব্যাখ্যা করতে না পারলে দাতাগোষ্ঠী সাহায্যের পারমাণ ৩০ শতাংশে নিয়ে আসার চিন্তা-ভাবনা করছে। সাহায্য সামগ্রী ও অর্থ এখন থেকে তাদের লোকাল এজেন্টের (এনজিও) মাধ্যমে বিতরণের চিন্তা-ভাবনাও রয়েছে। এমন কি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সাহায্য স্থগিত রাখারও তাদের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন বলতে তারা দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত না হয় এমন ব্যবস্থা বুঝাতে চাইছেন। বৈদেশিক সাহায্য মনিটরিং করাও বিপজ্জনক হয় যদি উল্লেখিত দু'টি ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অবস্থা দেশে বিরাজমান থাকে। এগুলোর ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠী অত্যন্ত সহনশীলতা ও সহমর্মিতার সাথে পরিস্থিতির উন্নয়ন কামনা করছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নতি করা না হলে ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। এ সমস্ত কারণে সরকার অনেকটা তড়িঘড়ি করে টাকার অবমূল্যায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চেষ্টা করছেন। আশান্বিত সাহায্য না পাওয়ার

www.pathagar.com

কারণে সরকার অভ্যন্তরীণভাবে ঋণ গ্রহণ বিশেষ করে ব্যাংক থেকে বিগত ৪ বছরে ৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করে হলেও শেষ রক্ষার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মূলত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে যাতে আর টান না পড়ে, মোটামুটি একটি সন্তোষজনক অবস্থায় পৌঁছানোর জন্যই টাকার এই অবমূল্যায়ন ঘটানো হয়েছে।

শুধু অবমূল্যায়ন নয় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য রয়েছে আরো কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ

বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি খতিয়ে দেখলে বা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রপ্তানি বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে আনুষঙ্গিক আরও কিছু বিষয়। যেমন রফতানি বাড়াতে হলে দেশের বিদ্যুৎ সঙ্কট সমাধান করতে হবে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর উন্নয়ন, পাশাপাশি বন্দরকে বিশৃঙ্খলামুক্ত করতে হবে যাতে করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন ব্যাঘাত না ঘটে। পানি গ্যাস চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে। ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সংস্কার করতে হবে। অর্থাৎ মুদ্রা ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সংস্কার করতে হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে চাঁদাবাজ ঘুষসহ সকল অদৃশ্য অপচয় বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে হবে। এর ফলে সরকার পরিবর্তনে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন অসুবিধা হবে না। সেবার মান উন্নত করতে হবে। দাতা–গোষ্ঠীর প্রেরিত সাহায্য ব্যক্তি ও দলীয় উন্নয়নের স্বার্থে নয়–উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করতে হবে। শুধু অবমূল্যায়ন করে নয় বরং অর্থনীতির মূল কাঠামোগত বাধা দূর করতে পারলেই রপ্তানি আয় বাড়ানো সম্ভব।

উৎপাদন ব্যয় বাড়লে-পণ্যের বিক্রয় মূল্যও বাড়ে

দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান তার ম্যানুফেকচারিং কষ্ট-এ এখন থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল, গ্যাস এবং টাকার অবমূল্যায়নে যে পরিমাণ টাকা বেশি লাগবে উৎপাদন খরচের সাথে তা যোগ করে পণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করবে। এর সাথে আরও যোগ হবে শুল্ক কর। সুতরাং সাধারণ ক্রেতারাই হবে এর ভোগান্তির শিকার। আমাদের দেশ মূলত একটি আমদানি নির্ভর দেশ যার বাণিজ্যে সবসময় ঘাটতি ও প্রতিকূল অবস্থা বিরাজমান থাকে। ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে আমদানিকারকদের এলসি খুলতে গেলে এখন প্রতি ডলারের বিপরীতে অতিরিক্ত ৩ টাকা বেশি দিতে হবে। কাঁচামাল ছাড়া দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বলতে গেলে প্রায় অচল। আর এই কাঁচামাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ দেশে ছোট বড় মিলিয়ে ৪ শ -এর অধিক ওষুধ কোম্পানি রয়েছে। ওষুধের কেমিক্যাল ও প্যাকেজ সংক্রান্ত কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনতে হয়। গৃহ নির্মাণ এবং বস্ত্র তৈরি শিল্প প্রতিষ্ঠানে রং-এর কেমিক্যালসহ যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন হয় তার বেশির ভাগই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

www.pathagar.com

সুতরাং ওষুধ, বস্য ও গৃহ নির্মাণসহ আমদানি নির্ভর সকল পণ্য ও কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে প্রতিষ্ঠিত এ্যালামেন্ট ও প্লাস্টিক পেইন্ট কোম্পানি তাদের রং-এর দাম বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে। কৃষি কাজে কীটনাশক ওষুধ এবং জমিতে ব্যবহারযোগ্য সার তৈরির কেমিক্যালও বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। সেহেতু কীটনাশক ওষুধ ও সারের দামও বেড়ে যাবে। এর সাথে যোগ হবে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের বাড়তি মূল্য। মোট কথা কৃষক-শ্রমিক, দিনমজুর ও পেশাজীবী থেকে শুরু করে আপামর জনসাধারণকে এখন থেকে অতিরিক্ত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হবে। কারণ সরকার চাপিয়ে দিয়েছে উৎপাদনকারী ও আমদানিকারকদের উপর, তারা চাপিয়ে দিয়েছে সরাসরি পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে জনসাধাণের উপর। সুতরাং এক বাক্যে বলা যায় মূল্য বৃদ্ধির কারণে চূড়ান্ত ভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এদেশের খেটে খাওয়া গরিব জনসাধারণ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশী চা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার হারাতে বসেছে ঃ সরকার উদাস

একসময় বাংলাদেশী চা বিশ্বের অন্যতম চা বলে খ্যাতি অর্জন করেছিল। আজ সেই চা-শিল্পের করুণ অবস্থা বিরাজমান। পাট, চা, চামড়া, তুলা ও আখ এগুলো ছিল বাংলাদেশের অর্থকরী ফসল। প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতো এইগুলো রপ্তানি করে। স্বাধীনের পর পাট গুদামে আগুন লাগিয়ে পাট শিল্পকে ধ্বংস করা হয়েছিল। তেমনি বর্তমান আওয়ামীলীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর কুচক্রি মহল ষযন্ত্রমূলকভাবে সিলেটের শ্রীমঙ্গল অক্সিডেন্টাল গ্যাস ফিল্ডে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়েকদিন ধরে চা বাগানগুলিকে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই পোড়া বাগানগুলির টিলায় টিলায় সবুজের সমারোহ এখন আর দেখা যায় না। বাগানগুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনারও কোন সক্রিয় ব্যবস্থা সরকারিভাবে নেয়া হয়নি। সে জন্য চা উৎপাদন আগের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৫৫ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদিত হয়। এর ৬০ শতাংশ স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় এবং রপ্তানি হয় ৪০ শতাংশ।

ইদানীং বাংলাদেশের চায়ের স্থানীয় বাজারকে নষ্ট করার জন্য ভারত থেকে আধুনিক প্রক্রিয়ায় প্যাকেটে করে বাংলাদেশে ভারতীয় চা আসছে যা থেকে সরকার কোন শুল্ক পাচ্ছে না। চা পায়ীদের আমরা যতটা আকৃষ্ট করতে পারছি তার চেয়ে বিদেশি ব্রাণ্ডের চা কোম্পাণিগুলো পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে চা বাজারে ছাড়ছে বিধায় ভোক্তারা সহজে আকৃষ্ট হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী চা-শিল্পে এখন করুণ অবস্থা বিরাজ করছে। পাকিস্তান, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও ইরাকের একচেটিয়া বাজার হারানোর পর ইউরোপের বাজারও হারাচ্ছে এখন বাংলাদেশি চা। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় বিগত দশকে যে পরিমাণ চা বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তাণী হতো সেটা এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশী চায়ের বাজার এখন ভারত, শ্রীলংকা ও কেনিয়া দখল করে নিয়েছে।

এই শিল্পের সাথে যারা জড়িত তারা বলেছেন সরকারের নীতিনির্ধারকদের উদাসীনতা, বাস্তবভিত্তিক নীতিমালার অভাব, উৎপাদক শ্রেণীর সাথে চা বোর্ডের সমন্বয়হীনতা, প্রশাসনিক জটিলতা, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, ভেজাল মিশ্রণ এর ফলে চা-এর গুণগত মান বজায় থাকছে না ইত্যাদি ছিল চা শিল্পের করুণ অবস্থায় পতিত হওয়ার মূল কারণ।

www.pathagar.com

প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ থেকে ৩ কোটি ১০ লাখ কেজি চা বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই চা আড়াই কোটি কেজির বেশি রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না। মাঝখানে ২ টি বছর ১৯৮৫ ও ১৯৯৩ সালে অবশ্য ৩ কোটি কেজির বেশি চা রপ্তানি করা হয়েছিল। ৯৪-৯৫ অর্থ বছরে ২ কোটি ৬৭ লাখ ২০ হাজার, ৯৫-৯৬ অর্থবছরে ২ কোটি ১৪ লাখ ২০ হাজার, ৯৬-৯৭ অর্থ বছরে ২ কোটি ৫৩ লাখ ৯০ হাজার, ৯৭-৯৮ অর্থ বছরে ২ কোটি ৪৪ লাখ ৫ হাজার এবং ৯৮-৯৯ অর্থ বছরে ২ কোটি ৩৪ লাখ ৫ হাজার কেজি চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়। উল্লেখিত হিসাব অনুযায়ী রপ্তানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ছোট বড় মিলে ১৫৮ টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ২০ টি, মৌলভীবাজার জেলায় ৯১ টি, হবিগঞ্জ জেলায় ২৩ টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২২ টি, কাপ্তাইতে একটি এবং রাঙামাটিতে একটি। বর্তমানে ১৩৫ টি বাগানে চা উৎপন্ন হচ্ছে। চা বাগানের মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ ১৩ হাজার ৮ শ ৬৪ হেক্টর, এই জমির পুরোটাতে চা চাষ হয় না। চা উৎপাদন হচ্ছে এর অর্ধেকেরও কম জমিতে। যার পরিমাণ হচ্ছে ৪৮ হাজার ৫৭ হেক্টর। সমস্যাটা এখানেই বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। পুরো চা বাগানের জমিতে চাষ না হওয়ার কারণে চা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ করে বাইরে চা রপ্তাণী করা আশানুরূপভাবে সম্ভব হচ্ছে না। এরই সুযোগে কয়েকটি বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশি চায়ের বাজার দখল করে নিয়েছে। সূত্র মতে রপ্তানিকারকরা মূলত চাহিদানুযায়ী চা পাঠাতে ব্যর্থতা ও চায়ের গুণগত মান সঠিক না থাকার কারণে তারা ভারত, কেনিয়া, শ্রীলংকা ও চীন থেকে চা কেনার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দুঃখজনক যে ভারত আজ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রথম স্থান দখল করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরে রপ্তানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে চা-এর রপ্তানি সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে। ৫৮·১৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে পূর্বের তুলনায়। মূলত চা এর রপ্তানি ৯৪-৯৫ অর্থবছর থেকে কমতে শুরু করেছে। (তথ্য সূত্র সাপ্তাহিক ২০০০, ২৩ আগস্ট ২০০০)

আইটি সি ও বিটিবি বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয় ১৯৯৪ সালে ভারত ১৪ কোটি ৯৩ লাখ ১৭ হাজার কেজি চা রপ্তানি করলেও ১৯৯৮ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২০ কোটি ২৮ লাখ ৪০ হাজার কেজিতে। এইভাবে শ্রীলংকা ৯৪ সালে ২২ কোটি ৪২ লাখ ৩৫ হাজার, চীন ১৭ কোটি ৯৬ হাজার, ক্যামেরুন ৩ কোটি ১ লাখ ৭৬ হাজার, কেনিয়া ১৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ও আর্জেন্টিনা ৫ কোটি ৯০ লাখ ২১ হাজার কেজি চা রপ্তানি করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু বাংলাদেশে ৯৪ সালে ২ কোটি ৩৬ লাখ ৪০ হাজার কেজি চা রপ্তানি করলেও ৯৮ সালে তা কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ২২ লাখ ২৭ হাজার কেজিতে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় এক সময় রাশিয়া, ইরাক, পাকিস্তান ও পোল্যাণ্ডে বাংলাদেশী চায়ের একচেটিয়া বাজার ছিল। আজ সেই

www.pathagar.com

দেশগুলিই কেনিয়া, ভারত, ও শ্রীলংকামুখী হয়ে পড়েছে। ক্রেতাদের ঝুকে পড়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে–সেসব দেশের চায়ের মান উন্নত, স্বাদ ও রঙ অতুলনীয়, সর্বোপরি চায়ের মূল্য বাংলাদেশের চেয়ে কম এবং চায়ের উৎপাদনও বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের চায়ের মানহ্রাস এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ অনুসন্ধান পূর্বক জানা গেছে খড়া, অনাবৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বিদ্যুতের নিয়মিত লোডশেডিং, গ্যাস সংযোগ না থাকা, মালিক–শ্রমিক দ্বন্দ্ব, ব্যাংক ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি, বৃক্ষ নিধন, উইপোকা, রেড স্পাইডার, থ্রীপসের আক্রমণ, রাসায়নিক দ্রব্যের অবাধ ব্যবহার, সার প্রয়োগে অনীহা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং চায়ের মান উন্নয়নে বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনিস্টিটিউটের যথাযথ উদ্যোগের অভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে। অভিজ্ঞমহলদের ধারণা সরকারই চা শিল্পের এই অব্যবস্থা থেকে কার্যকরী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে পারেন। সরকার যত্নবান হলেই চা শিল্পের করুণ অবস্থা থেকে অব্যাহতি লাভ সম্ভব। যুগোপযোগী চা নীতি প্রণয়ন, চা শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও ব্যক্তিদের সমন্বিতকরণ, টি বোর্ডকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো, আন্তর্জাতিক বাজার সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, কম সুদে ও সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। অন্যথায় চা শিল্পকেও সোনালী আঁশ পাটের মত ভাগ্য বরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

বাজেটে ব্যক্তি কর নির্ধারণে কিছু প্রস্তাব

বর্তমান দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে টাকার মূল্য দ্রুত কমে যাচ্ছে। নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থা এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনজীবন আজ চরম ভোগান্তির শিকার। দেশে বিগত ৩০ বছরে যতই ওলট-পালট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে ঘটেছে–তার মধ্যে ভালোর চেয়ে মন্দের পাল্লাই ভারী। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকেই মন্দের সেই সিংহভাগটি নিজেদের স্কন্ধে বহন করতে হয়েছে। সরকার বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন খাতে যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ কর, ভ্যাট ও আবগারি শুল্ক বাড়িয়েছে তার সবটুকুই এ দেশের সাধারণ মানুষই বহন করেছে।

কর সম্পর্কে কিছু প্রস্তাব

(১) সর্বোচ্চ করমুক্ত আয় ঃ বর্তমান শহর-নগর-বন্দরে যারাই চাকরি করছেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে নগরীতে বসবাস করছেন তাদের সংসারে মাসিক ব্যয় হচ্ছে নিম্নতম ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। ১০ হাজারের কম বেতনে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভাড়া বাড়িতে থেকে সংসার চালানো কারো পক্ষে এখন সম্ভব হয় না। সুতরাং বলা যায়, একজন পরিবারের সংসার ধর্ম পরিচালনা করতে তার বছরে ব্যয় হয় মোট ১,২০,০০০ টাকা। তাই আমরা বাস্তবতার নিরিখে বাঁচার প্রত্যাশায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে প্রস্তাব রাখছি যাতে বর্তমান ৭৫,০০০ টাকার স্থলে নিম্নতম পক্ষে ১,২৫,০০০টাকা আয় পর্যন্ত কর রেয়াতের ব্যবস্থা করা হয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্দ্ধগতি এবং অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থায় যদি ১,২৫,০০০ টাকার ইনকাম গ্রুপ-এর ওপর বর্তমান করের অব্যবস্থা অব্যাহত থাকে তাহলে সীমিত আয়ের মানুষকে কি করুণ অবস্থায় পড়তে হয় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষের বৃহত্তম স্বার্থে নিম্নতম ১,২৫০০০ পর্যন্ত Zero base tax প্রবর্তন করার সুপারিশ করছি।

(২) বাড়িভাড়া ভাতা করমুক্ত করা হোক ঃ বর্তমান নগর ও শহরের বাড়ির মালিক যে তলায় বসবাস করেন তা করমুক্ত হিসেবে গণ্য হচ্ছে। কিন্তু তিনি যদি কোন চাকরিজীবী হন তাহলে বাড়ি ভাড়াভাতা মূল বেতনের শতকরা মাত্র ৫০ ভাগ অব্যাহতি

www.pathagar.com

দেয়া হয়। এক্ষেত্রে সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে যে, সকল চাকরিজীবীদের জন্যেও বাড়িভাড়া ভাতা সম্পূর্ণ করমুক্ত করার ব্যবস্থা করা হোক। অথবা নিম্নতম ৫০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়িভাড়া করমুক্ত করার ব্যবস্থা করলে চাকরিজীবী ভাড়াটিয়ারা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের দুর্বিষহ জ্বালাতন থেকে কিছুটা হলেও রেহাই পেতো। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে বাড়িভাড়া করমুক্ত করা হয়েছে।

(৩) **Wealth Tax** (সম্পদ কর) ঃ সম্প্রতি ট্যাক্স কর্তৃপক্ষ ২ লাখ টাকার উপরে আয়ের লোকদের সম্পদ বিবরণী জমা দেয়ার জন্যে করদাতাদের প্রতি আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বার্ষিক ১ লাখ টাকা যেখানে দেশে পরিবারের ভরণপোষণ ব্যয়ই হয় সেখানে এ করদাতার পক্ষে সম্পদ গড়ে তোলার কোন প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত হবে এই অংশ নিম্নতম ৪,০০,০০০/- (চার লাখ) টাকা পর্যন্ত বাড়ানো। বাংলাদেশে কর ফাঁকি দেয় এমন কোটিপতি রয়েছেন যাদের সম্পদ বিবরণী সংশ্লিষ্ট ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কাছে তারা জমা দেন না, দিলেও তা আংশিক সম্পদ বিবরণী। ঘুষ বিনিময়ের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়ম, ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের কিছু লোকের সহায়তা নিয়মিত ঘটছে। যারা তাদের আয় এবং সম্পদের ওপর কর ফাঁকি দিয়ে চলছেন তারা সম্পদের উচ্চবিত্ত শ্রেণীরই মানুষ, সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা খুবই কম।

(৪) **Wealth Tax** (সারচার্জ) ঃ সম্পদ ১০ লাখ টাকা অতিক্রম করলে আয়করের ১০% হারে সারচার্জ আরোপ করার বিধান করা হয়েছে। যদি কারও সম্পদ ১০ লাখ ১ টাকা হয় এবং তার আয় ১০ কোটি টাকা হয় তাহলে ১ টাকা বাড়তি সম্পদের জন্য ১ কোটি টাকা সারচার্জ দিতে হবে না কি? আমরা সারচার্জ আরোপের বিরুদ্ধে নই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে। সুতরাং বৈষম্য রোধকল্পে আইন প্রণয়ন আবশ্যক।

(৫) বিনিয়োগ ভাতা **(Admissible investment allowances for tax credit)** ঃ একজন ব্যক্তির মোট আয়ের ওপর যে ট্যাক্স নির্ধারণ করা হয়, তার থেকে নির্দিষ্ট একটি হারে বিনিয়োগ ভাতাসমূহ বাদ দেয়া হয়। অর্থাৎ Tax credit on investment এ একজন করদাতার কর রেয়াত পাওয়ার সুযোগ বেড়ে যায়। বিনিয়োজন সমূহগুলো হলো ভবিষ্যৎ তহবিল, সঞ্চয়পত্র, ডিপিএস, প্রিমিয়াম, শেয়ার, যাকাত ফাণ্ড, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, ডিপিএস এবং সঞ্চয়পত্র নতুনভাবে খোলা এবং ক্রয় করার সুযোগ কম। এ ক্ষেত্রে সঞ্চয়পত্র ছিল সাধারণ মানুষের জন্য ঝুঁকিহীন অত্যন্ত লাভজনক একটি বিনিয়োগ ব্যবস্থা এবং এ ব্যবস্থায় কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না। অর্থাৎ সবাই সুযোগটি গ্রহণ করতে পারতো। একদিকে এ ব্যবস্থায় লাভের অংক ভালো ছিলো তেমনি কর রেয়াতও পাওয়া যেত। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় সাধারণ করদাতাদের এই বড় সুযোগটি থেকে বঞ্চিত করেছে। উল্টো তারা বলেছেন

www.pathagar.com

শেয়ার ক্রয় করার জন্যে। সবাইকে নাকি সরকার শিল্পপতি বানাবেন। কিন্তু দেখা যায়, শুধু এক শ্রেণীর কালো টাকার মালিকরাই ব্যাংক ও স্টক মার্কেটের মেম্বারদের সাথে যোগসাজশ করে দেদারছে শেয়ার কিনছেন। সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা কোন শেয়ারই পাচ্ছে না। যারা লাখ লাখ টাকা শেয়ারের পেছনে Invest করছে, মূলত তারাই কোম্পানির একজন অংশীদার হতে পারছেন। ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের এ ক্ষেত্রে শেয়ার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। লটারির আশায় তীর্থের কাকের মতো দীর্ঘ তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়। সুদবিহীন অবস্থায় শুধু এই টাকা ফেলে রাখা ছাড়া তাদের বিকল্প কোন পথ খোলা নেই। সুতরাং সাধারণ করদাতাদের জন্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের এই বিনিয়োগ ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার রূপ নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় এক শ্রেণীর আমলা এবং কালো টাকার মানুষের ভাগ্য খুলে গেছে। তাছাড়া বর্তমান শেয়ার বাজারেও প্রচণ্ড ধ্বস নেমেছে। সুতরাং এটি এখন ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসা। সেহেতু পেনশন ডিপোজিট স্কীম এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের পূর্বের ২১% লভ্যাংশসহ কর রেয়াতের সকল ব্যবস্থাদি পুর্নবহাল করলে চাকরিজীবী মানুষের উপকার হতো।

(৬) ফ্যামিলি প্লানিং ইনসেনটিভ ঃ সরকার কর রেয়াতের আওতায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদফতরের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের জন্যে একটি স্কীম খুলতে পারে। সীমিত পরিবারই এই সুযোগটি পাবে। ফলে দেশে স্ফীত জনসংখ্যা যেমন একদিকে রোধ করা সম্ভব হবে তেমনি একজন করদাতা করের ভয়ে অধিক সন্তানাদি জন্ম দেয়া থেকেও সে সাবধানতা অবলম্বন করবে। সুতরাং ফ্যামিলি প্লানিং ইনসেনটিভ স্কীমটি কর মওকুফ হিসেবে গ্রহণ করে সরকার দেশকে একটি সুখী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। চীন সহ প্রাচ্যের বহু দেশে এই ব্যবস্থা চালু আছে। ভারতও চিন্তা–ভাবনা করছে। আমরাও এই ব্যবস্থাটি জাতীয় স্বার্থে দেশে চালু করতে পারি।

(৭) নগরে শিক্ষাখাতে খরচ ভাতা (Educational Expense Allowancess) ঃ দেশের সকল নাগরিকদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রয়াসে সরকার কর রেয়াতের এই স্কীমটি গ্রহণ করতে পারে। যে করদাতার দুটি সন্তান স্কুলে পড়াশোনা করবে তার মাসিক বেতন বছরান্তে গুণ করে বিনিয়োগ ভাতার মতো কর মওকুফের ব্যবস্থা করলে ২০০৫ সালের মধ্যে 'সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচি' সরকারের এই শ্লোগান বাস্তবায়নে ত্বরিত ভূমিকা পালনে সহায়ক হতো। আমরা চাই সরকার এই ব্যবস্থাটি ২০০১-২০০২ সালের অর্থবছরই বাস্তবায়ন করে সাধারণ মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসবেন।

দেশে আজ বহু লোক তাদের ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। সবাই যাতে তাদের আয়ের ওপর কর দেয় সে জন্যে কর আইনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। বহু ক্ষেত্রে দেখা

www.pathagar.com

গেছে কর কর্তন অথবা কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে কর একেবারেই কর্তন হয় না। এ সমস্ত ব্যাপারে আয়কর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব বেশি। Taxes Appllate Tribunal আপিলাত আদালত ঢেলে সাজাতে হবে কর কর্তন ও আদায়ের ক্ষেত্রে অনিয়মগুলো দূর করার জন্য। আইনের দুর্বলতার ছিদ্র পথগুলো বন্ধ করতে হবে সরকারকে। এছাড়াও ট্যাক্স প্রদানে সবাই যাতে উৎসাহ পায় সে ব্যবস্থাদিও উল্লেখিত আলোকে সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। ট্যাক্স আইনকে সাধারণ মানুষের কল্যাণে আরও সহজতর করতে হবে। ট্যাক্স নির্ধারণে যদি সবারই কল্যাণের দিক নির্দেশনা থাকে, তাহলে কর আরোপ কখনো ভীতিজনক অবস্থায় জাতির কাছে ধরা দেবে না। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণেই মানুষ তখন উৎসাহের সঙ্গে কর প্রদান করবে। কর ফাঁকি দেয়ার কোন প্রশ্নই থাকবে না।

www.pathagar.com

সাপ্টা এবং এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি আর ট্রানজিট চুক্তি এক নয়

সাপ্টা এবং এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি নিয়ে সরকার অপব্যাখ্যা দিচ্ছে। আমরা জানি যে, সাপ্টা এবং এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তি ছিল একটি বহুজাতিক চুক্তি। সাতটি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রী আনা-নেয়া অর্থাৎ সাপ্টা চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের ওপর দিয়ে পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও সিআইএস দেশগুলোতে পণ্য পৌছানোর সুযোগ পাওয়ার কথা। অথচ শেখ হাসিনা সরকার তা না করে কেবল দ্বিপাক্ষিকভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সাপ্টা চুক্তির ১২ নম্বর অনুচ্ছেদ যে কথাটি লেখা রয়েছে তা হলো—Article 12 Communication transport transit contracting states agree to undertake appropriated steps and measures for developing and improving communication system transport infrastructure and transit facilities for accelerating the growth of trade with in the region. কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, এই সার্ক অঞ্চলের সকল দেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ অবকাঠামো ও ট্রানজিট সুবিধা বৃদ্ধি করতে যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই চুক্তিতে কোথাও দ্বিপাক্ষিকভাবে কেবল ভারত ও বাংলাদেশের স্বার্থ বিবেচনা করার সুযোগের কথা উল্লেখ নেই। এতে ভারতকে করিডোর দেয়ার কোন কথাও উল্লেখ নেই। এই সরকার সাপ্টা চুক্তির ধারে কাছেও নেই। সাপ্টা চুক্তির নাম করে অতীতের সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে শুধু দাদাদের খুশি করার জন্যে ভারতের সাথে ট্রানজিট চুক্তি করেছেন। সার্ক ভেঙ্গে দিয়ে ভারতকে খুশি করার জন্যে উপ আঞ্চলিক সংস্থা গঠন করলেন। যেখানে সাপ্টা চুক্তির অর্থ সাতটি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা, তা না করে তিনটি দেশকে বাদ দিয়ে শুধু ভারত, নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করে সাপ্টার মূল উদ্দেশ্যের বেদীমূলে আওয়ামী লীগ সরকার কুঠারাঘাত করেছে। সরকারই মিথ্যাচার করছে যে-অতীতের সরকারের সাপ্টা চুক্তিই আমরা বাস্তবায়ন করছি।

www.pathagar.com

মূলত যে তিনটি দেশ নিয়ে ভারত উপ-আঞ্চলিক জোট গঠন করেছে সেই তিনটি দেশই ভারতের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে ভারতের অনুগামী দেশ। ভারত যখন যা বলবে তখন মীর জাফরী কায়দায় তা তারা মেনে চলবে। ক্ষমতায় বসেই তারা ভারতীয় নর্তকী ও বাঈজী এনে বাংলাদেশের মানুষকে জারজ সন্তান উপাধি উপহার দিয়েছে। এটা ভারতের প্রথম সেলিব্রেটেড-বাংলাদেশকে নতজানু রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত করার। বর্তমান সরকার সেই জারজ সন্তান খেতাবের কোন প্রতিবাদ করেনি উল্টো তাদের রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করেছেন। অন্য কোন সভ্য গণতান্ত্রিক দেশ হলে তাদেরকে আজ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ছাড়তো। দুঃখজনক যে বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান উপন্যাসিক কিছুদিন আগে সস্ত্রীক ভারত সফরে গিয়েছিলেন। ওনাকে সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়নি। এমনকি সেখানকার শিল্পী সাহিত্যিকরাও তার খোঁজ খবর পর্যন্ত নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ বাংলাদেশে ভারতীয় শিল্পী সুনীল, রবী শঙ্কর ও অন্নদা বাবুরা এসে রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনাসহ রাষ্ট্রীয় খরচে প্রথম শ্রেণীর হোটেলে থাকার সুযোগ পায়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাদের খোঁজ খবর নেন।

নতজানু সরকার ভারতকে খুশি করার জন্যে ২৫ বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার পূর্বেই পানিচুক্তির নামে ৩০ বছরের জন্যে দেশের মানুষকে পানিহীন অবস্থায় ফেলে দেয়ার এক অসম চুক্তি করেছেন। এ কারণে পানি সমস্যা নিয়ে আগামী ৩০ বছর পর্যন্ত বিশ্ব দরবারে আর কোন কথা বলা যাবে না। সালীসীর ব্যবস্থা নেই, গ্যারান্টী ক্লজ রাখা হয়নি। এরই নাম দেয়া হয়েছে পানি চুক্তি। পদ্মার এক মাঝি বলেছেন গঙ্গার জল পদ্মায় দেখছি না-মনে হয় আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পদ্মাপাড়ের আরেক কৃষক আক্ষেপের সুরে বলেছেন গঙ্গার জল আসবে বর্ষা মওসুমে-পদ্মাপাড়ের মানুষগুলোকে ভাসিয়ে মারার জন্যে।

দুঃখজনক যে তসবিহ আর হেজাব লাগিয়ে ক্ষমতায় আসলেন-এসেই আবার খাজা বাবা ও নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার নামে ট্রানজিট দিলেন-যাতে মানুষ না বুঝে আনন্দে লাফাতে থাকে। সড়ক পথে ট্রানজিটের পাশাপাশি এই সরকার দাদা-দিদিদের খুশি করার জন্যে চট্টগ্রাম বন্দরের নিয়ন্ত্রণও ভারতের উপর ছেড়ে দেয়ার কথাও চুপিসারে চলছে। এখন গোলামী চুক্তি নবায়ন করলেই কি, না করলেই কি? গোলামী চুক্তির চেয়েও বড় বড় চুক্তি এই সরকার ক্ষমতায় এসেই ৯ মাসের মধ্যে সেরে ফেলেছেন। বাংলাদেশের পতাকাও ভারতীয় পতাকার অনুকরণে রূপান্তরিত করার চিন্তা-ভাবনা চলছে। রবী ঠাকুরের রচিত জাতীয় সঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীতেরই ডুপলিকেট। জাতীয় ফুল শাপলা-যা ভারতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে রাখা হয়েছে। শাপলা ফুলকে হিন্দুরা দেবী হিসেবে মেনে চলে-তাই দেব-দেবীর পূজায় এই শাপলা ফুল ব্যবহার করে তারা। দেশের ঐতিহ্য অনুসারে গোলাপই হওয়া উচিত ছিল আমাদের জাতীয় ফুল এবং নজরুলের গাওয়া

www.pathagar.com

জাতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত গানকে করা উচিত ছিল জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু তা না করে প্রকৃতভাবে আমরা আমাদের স্বাধীন সত্তা, অস্তিত্ব এবং স্বাধীন সীমান্তরেখা সবকিছুই ভারতের শাসকদের কাছে বন্ধক রেখে ওদের রাষ্ট্রীয় নীতি ও আদর্শ গ্রহণ করে চলছি। এভাবে কোন স্বাধীন জাতি শির উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। দেশের অবস্থা এমনই এক জটিল অবস্থায় রূপ নিয়েছে মনে হয় অচিরেই বেরুবাড়ি আর তালপট্টির মতো পার্বত্য চট্টগ্রামও আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেখান থেকে সেনাবাহিনী উঠিয়ে নেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। নিকট ভবিষ্যতে বাংলাভাষীরা সেখানে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। শান্তি বাহিনীর পাঁচ দফা চুক্তিতে নাকি সে ধরনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আমরা জানি যে একজন ভারতীয়, তার জন্মস্থান যে অঞ্চলেই হোক না কেন-ভারতের যে কোন স্থানে বসতবাড়ি করে থাকার তার অধিকার রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে একজন বাংলাদেশীর সেই অধিকার থাকবে না কেন? ভারতের প্ররোচনায়ই শান্তি বাহিনীর লোকরা এ ধরনের অযৌক্তিক দাবি বাংলাদেশের নতজানু সরকারের কাছে উত্থাপন করার সাহস পাচ্ছে।

দুঃখজনক যে সরকার সারাদেশে শিখা চিরন্তনের নামে মশাল র‍্যালির যে অগ্নিপূজার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন–তার সাথেও ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পার্শিরা অগ্নিপূজা করে আর এই পার্শিদের সাথেই ভারতীয়দের বিবাহ শাদী ঘটে থাকে। হিন্দুরা মারা গেলে আগুন দিয়ে পুরে ভস্মীভূত করা হয়। যাতে পরকালে পাপ পুণ্যের কোন বিচার না হতে পারে। এই শিখা চিরন্তন দিয়ে বর্তমান সরকার একজনের রুহের মাগফেরাত কামনা করছেন এবং মশাল স্তম্ভটি বিভিন্ন এলাকার বয়সবৃদ্ধ মানুষের কপালে স্পর্শ করিয়ে দিচ্ছেন। যে কপাল শুধু আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে ঠেকানো যাবে না– সেই কপালে মশাল স্তম্ভ ছোঁয়ানো হচ্ছে। এই অগ্নিপূজার কারণে একদিন পারস্য সাম্রাজ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশ সরকারও কি আমাদের সেই পথে ধাবিত করছেন ? বাংলাদেশে ভারতের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুবিধার্থে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী (যারা ভারতীয় পণ্যের হোলসেলার) ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ইঙ্গিতেই সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবারের স্থলে রবিবার ধার্য করার প্রস্তাব করেছেন। মেট্রোপলিটন চেম্বার, ফরেন চেম্বার, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং বিজিএমই-এর এক শ্রেণীর কর্মকর্তা এই দাবি সরকারের কাছে উত্থাপন করেছেন। কারণ ভারতীয়দের সাথে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন। এ দেশী কিছু ব্যবসায়ীও ভারতে অফিস খুলেছেন। তাদের স্বার্থেই কাজটি করতে তারা আগ্রহী। এরই নাম দিয়েছেন তারা মুক্ত বাজার অর্থনীতি।

যে কথাটি বলছিলাম বিজাতীয় চিন্তা-চেতনার সুতার নাটাই এখন তৎপর–কারণ তাদের পছন্দনীয় সরকার এখন ক্ষমতায়–যা করতে হয় এই সরকারের আমলেই করতে হবে। '৭২-'৭৫-এর সময়কালেও তারা সেই একই কাজ খুব দ্রুতগতিতে সেরে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। আজও সেই একই পথে তারা অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সুতরাং নতজানু বেনিয়া গোষ্ঠীর ছোবল থেকে দেশের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে

www.pathagar.com

ইসলামী এবং জাতীয়তাবাদী দেশ প্রেমিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এই মুহূর্তেই শুরু করতে হবে। অন্যথায় দেশের জাতিসত্তা বিলীন হয়ে যাবে এবং ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্থান ঘটবে এই অঞ্চলে। '৭০ দশক থেকেই এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গ নিয়ে যে কথাটি বলছিলাম–বর্তমান সরকার সাপ্টা চুক্তির ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ভারতকে করিডোর দেয়ার চুক্তি জায়েজ করার প্রয়াস চালাচ্ছে। দেশের ঝানু কূটনীতিকরা বলেছেন ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সীমান্ত যোগাযোগ রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর মধ্যেও এ ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ভারত পাকিস্তানেও এক ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। কিন্তু ভারতের এক অঞ্চলের মালামাল বাংলাদেশের ওপর দিয়ে আবার ভারতেরই অন্য অঞ্চলে পৌছানোর জন্যে আরেকটি দেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সৌদি আরবও হজ্বের সময় এ ধরনের ট্রানজিট তার প্রতিবেশীদের দেয়নি। আমরা জানি সাপ্টা চুক্তিতে যেসব বিধান বা আইনানুগ ব্যবস্থা রয়েছে তা কেবলই বাংলাদেশ ও ভারতের উপর প্রযোজ্য নয়। এটা সার্কভুক্ত সাতটি দেশের জন্যে প্রযোজ্য। পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সাথে ভারতের বহু সমস্যা এখনো অমীমাংসিত রয়েছে। এ ২টি দেশ ছাড়াও মালদ্বীপও উপআঞ্চলিক জোট সমর্থন করেনি। অথচ সরকার একদিকে সার্ক ও সাপ্টা চুক্তির দোহাই দিচ্ছে অন্যদিকে সার্কবিনাশী তৎপরতা চালাচ্ছে। ৭ টি দেশের স্থলে ৪টি সার্ক দেশ নিয়ে গঠন করতে যাচ্ছে উপ-আঞ্চলিক গ্রুপ। সার্কের মূল কাঠামোগত আদর্শকে অকার্যকর করাই ছিল এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য।

সার্ক না থাকলে সাপ্টা অর্থহীন। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে সমপরিমাণ এবং সমমূল্যে বাণিজ্য চুক্তির নামই সাপ্টা, বিষয়টি এভাবে বললে মনে হয় আরও পরিষ্কার হবে যেমন– ভারত বাংলাদেশ থেকে ১০ কোটি টাকার মাল ক্রয় করলে তখনই বাংলাদেশ ভারত থেকে ১০ কোটি টাকার মাল ক্রয়ের টেন্ডার দিতে পারে। পরিমাণের কিছু পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ ১০০ কোটি টাকার মাল কিনবে, এর পরিবর্তে ভারত কিনবে মাত্র ১০ কোটি টাকার পণ্যসামগ্রী। যার ব্যবসায়িক আনুপাতিক হার হবে ১০ ঃ ১। মূলত এই নীতিই ভারত কামনা করছে যা জাতির অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে। সাপ্টার মূল উদ্দেশ্য ৭ টি দেশেই যেন সমভাবে কার্যকরীরূপ লাভ করে তারই যুগান্তকারী ব্যবস্থা সরকারের গ্রহণ করা উচিত। আওয়ামীনেত্রী বিরোধী দলে থাকাকালীন সময়ে গর্ব সহকারে বলেছিলেন বাংলাদেশকে ভারতের বাজারে পরিণত করা হয়েছে এবং এক কলসি পানিও বিএনপি সরকার বিগত পাঁচ বছরে আনতে পারেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির তারা আজ দেখছে বাংলা ভারত Open Trade এবং পানি চুক্তির নামে উল্টো পদ্মার পানি পূর্বের চেয়েও হ্রাস পেয়েছে। যদি ধরে নেই বিএনপি সরকার ভারতের সাথে অসম চুক্তি করেছিল। কিন্তু বিএনপি যে সমস্ত কাজ করেছে, সেই একই

www.pathagar.com

কাজ কেন আপনার সরকার চালু রাখবে ? আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইস্তিহারে এ ধরনের কোন কথা উল্লেখ ছিল না। সুতরাং আওয়ামীলীগ সরকারের উচিত অতীতের ওপর দোষ না চাপিয়ে জাতীয় স্বার্থে কর্মসূচি দেয়া এবং তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। এতে বর্তমান সরকারের যেমন মঙ্গল হবে তেমনি দেশ ও জাতির মঙ্গল ঘটবে।

নগরীর আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ঃ ক্ষতিকর প্রভাব ও সরকারের দায়িত্ব

পৃথিবীর প্রতিটি দেশের রাজধানী শহর স্বাস্থ্যকর পরিচ্ছন্ন একটি নগরী ও পরিবেশ দূষণমুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার যুগোপযোগী একটি অঙ্গিকার রাষ্ট্রীভাবে থাকে। এ জন্য স্ব-স্ব দেশের রাষ্ট্রিয় প্রশাসন যন্ত্রের উর্ধ্বীর্তন কর্মকর্তারা নীতিনির্ধারণী কিছু আইন প্রণয়নও করে থাকেন। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে শুরু করে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলি পর্যন্ত ঐ আইনসমূহকে এমনভাবে ঢেলে সাজানো হয় যাতে করে আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকার মধ্যে কোন বিশৃংখলা বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির উদ্ভব না ঘটে। সেজন্য আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে একটি দূরত্ব বজায় রেখে সুদূর প্রসারিত পরিকল্পনা নিয়ে তারা নগরীকে ঢেলে সাজান। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে রাজধানীর বাইরে কয়েকশত কিলোমিটার দূরে শিল্প নগরী জোন তৈরি করা হয়। জাপান, কোরিয়া ও মালয়েশিয়ায় হাল আমলে এ ধরনের শিল্প নগরী জোন গড়ে তোলা হয়েছে। সে সমস্ত দেশে নগরীর আবাসিক এলাকায় কোন বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। কারণ এতে নগরীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও শৃংখলাবোধের অভাব দেখা দেয়। সে জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের রাজধানী শহরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার মধ্যে একটি দূরত্ব বজায় থাকে।

বিশ্বের প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করে একটি কোলাহলমুক্ত ছিমছাম সুন্দর নগরী দেশের মানুষের কাছে উপহার দিতে পারে। সে জন্য জাতিসংঘের তরফ থেকে প্রতি বছর বিশ্বস্বাস্থ্য ও বিশ্ববসতি দিবস নামে দুটি দিবস সারা বিশ্বে উদযাপন হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সচেতন করা। সে জন্য তারা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কার্টুন চিত্র, ওয়াল পোস্টার ও কিছু লিফলেট বিলির ব্যবস্থা করে থাকে। দুঃখজনক হলেও সত্য এশিয়ার মধ্যে ঢাকা, কোলকাতা ও করাচি এই তিনটি শহর বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সন্ত্রাসী ও নোংরা শহর হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এর মধ্যে ঢাকাই ছিল একমাত্র রাজধানী শহর। অপরিকল্পিত উপায়ে ঢাকা নগরীকে গড়ে তোলা হচ্ছে যুগ যুগ ধরে। সেই নবাবী আমল থেকে অদ্যাবধি ঢাকাকে একটি সুন্দর স্বাস্থ্যসম্মত নগরী হিসেবে গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। ঢাকা যে তিলোত্তমা নগরী সেটা শুধু বইপুস্তক ও সেমিনারের ব্যানারে শোভা পাচ্ছে, বাস্তবে এর প্রতিফলন খুব একটা নেই। উল্টো দেখা যায় নগরী আজ

www.pathagar.com

বাস্তুহারা (বস্তি), যানজট, আর সন্ত্রাসীর নগরীতে পরিণত হয়েছে। সুদূর প্রসারিত কোন পরিকল্পনা না থাকার কারণে নগরীর সৌন্দর্য্যেও দিনদিন ভাটা পড়ছে অর্থাৎ বার্ধ্যকের চেহারায় রূপ নিচ্ছে নগরী।

আজ প্রায় এক কোটি মানুষ পৌর এলাকায় ঠাসাঠাসি করে বসবাস করছে। গায়ে গায়ে মানুষ, পায়ে পায়ে মানুষ, এ যেন মানুষের শহর। বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার সর্বত্রই রাজধানীমুখী মানুষের প্রচণ্ড ভির পরিলক্ষিত হচ্ছে। ৬/৩/৯৮ দৈনিক সংবাদের প্রথম পৃষ্টায় একটি কার্টুন ছবি ছাপিয়েছে যার মর্মাথ অনেকটা এ রকম নগরীতে আজ গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। চাহিদা অনুযায়ী এগুলোর সরবরাহ অপর্যাপ্ত। নগরীর মানুষ দিন দিন লাকরী, কেরোসিন, হ্যারিকেন ও মোমবাতির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। ঢাকা নগরী এখন একটি উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির লাভা–যে কোন সময় এর বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। নিম্নতম শতাধিক বছরের পরিকল্পনা ছাড়া আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার কারণে অফিস ছুটি ও শেষ হওয়ার সময় যানজট এখন তীব্র আকার ধারণ করছে। শুধু সাত মসজিদ সড়কে ধানমণ্ডি সংলগ্ন এলাকায় বাই পাস সড়ক করা হয়েছে প্রায় এক ডজনের ওপর। অথচ রাস্তামাত্র তিন থেকে চার কিলোমিটার হবে। এ কারণে ঐ এলাকায় অফিস ও স্কুল চলাকালীন সময়ে যানজট নিত্য দিনের স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে স্বাস্থ্য এবং কাজের মূল্যবান সময় নষ্ট হচ্ছে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামল থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন মেয়াদে (4th +5th Year Master Plan) নেয়া পরিকল্পনাগুলো নগরীর অবকাঠামো নীতির ফাইলে এখনো বন্দি। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সেসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস চালানো সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাদপদ নগরীর এই হলো সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

সম্প্রতি পত্রিকায় এসেছে পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক লাইসেন্স দেয়ার একটি জোর লবিং চলছে। পৌর কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুচ্ছেন বলেও বিশ্বস্তসুত্রে প্রকাশ। ধরে নেয়া যাক-নগরীর কোন হকার মার্কেটের মধ্যেই যদি কোন আবাসিক এলাকা গড়ে তোলা হয় অথবা কোন আবাসিক এলাকায় যদি কোন হকার মার্কেট গড়ে তোলা হয় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? পুরো এলাকাটি কি তখন একটি বাজারের রূপ ধারণ করবে? নাকি এলাকাটি তখন একটি মিষ্টি মধুর সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হবে? কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষ নগরীর কোন এলাকায় এ ধরনের একটি অবস্থার প্রসার ঘটুক তা কখনোই চাইবেনা। চাইতে পারেনা। একজন মানুষ সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর একটু শান্তিতে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করার নিশ্চয়তার প্রত্যাশী। গৃহে এসে সে শুনতে চায় না অশান্তির কোন শব্দ। এটাই মানুষের সহজাত ধর্ম। যুগ যুগ ধরে মানুষ এটা কামনা করে আসছে। সম্প্রতি নগরীর কোন অভিজাত আবাসিক এলাকায় অন্তত পক্ষে কয়েক প্রকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান থেকে বিরত রাখার জোর দাবি বিভিন্ন পত্রিকায় চিঠি পত্র কলামে উঠেছে। তারা

www.pathagar.com

এও বলেছেন এ কারণে ইতিমধ্যেই অভিজাত এলাকায় শান্তি বিঘ্নিত ঘটেছে। বায়ু ও শব্দ দূষণে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য, জননিরাপত্তা ও পারিবারিক সকল কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে। যেমন কমিউনিটি সেন্টার, হোটেল, হাসপাতাল, স্কুল ও গার্মেন্টস শিল্প এবং বড় বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এ সমস্ত দূষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সরকারের উচিত হবে উল্লেখিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদান থেকে বিরত থাকা। আইন বর্হিভূত উপায়ে অথবা মোটা অংকের উৎকোচ গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এধরনের কোন ব্যবসার অনুমতি দেন তাহলে অবাঞ্ছিত যে কোন পরিস্থিতির জন্য তাদের জবাব দিহি করতে হবে। এলাকায় লোকসমাগম বেশি হলে পরিবেশগত হুমকির পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদাসমূহ যেমন বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও পয়ঃপ্রণালীর স্বাভাবিক ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে। বড় জোর পৌর কর্তৃপক্ষ বাণিজ্যিক এলাকায় ডিপার্টমেন্টাল ও মালটিপল সপ এবং ছোট খাট অফিসের লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এতে এলাকার জনগণের কেনাকাটার সুযোগ ঘটবে। গুলশান, উত্তরা, বারিধারা ও বনানীর আবাসিক এলাকায় এ ধরনের কিছু বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এমন কোন বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুমতি দেয়া উচিত নয় যার কারণে আবাসিক এলাকা বাজারের রূপ ধারণ করতে পারে। নগরীর আবাসিক এলাকায় পরিবার পরিজন নিয়ে যারা বসবাস করছেন তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। সুতরাং বিপুল জনগোষ্ঠীর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে পৌর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে আমরা আবেদন রাখবো যাতে আবাসিক এলাকায় কোনরকমেই যেন বৃহৎ কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অনুমতি প্রদান করা না হয়। আন্তর্জাতিক বসতি, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য আইনের কথা বিবেচনা করে স্বাস্থ্যসম্মত সুখী সমৃদ্ধ একটি পরিচ্ছন্ন নগরী গড়ার প্রত্যাশায় সরকারকে বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে।

---

www.pathagar.com

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণবিধি কেমন হওয়া উচিত

দেশ স্বাধীনের পর থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দিন দিন যেভাবে রুগ্নতার দিকে ধাবিত হচ্ছে তাতে একরকম ব্যথিত হয়েই, বলতে পারেন অনেকটা বিবেকের তারনায় বহুদিন ধরে আমি শিল্প ব্যবস্থাপনার উপর কিছু একাডেমিক নিবন্ধ লেখার চেষ্টা করেছি। পত্রিকায় লেখাগুলি প্রকাশও হয়েছে। ধারাবাহিকতা রক্ষাকল্পে আজকের এই নিবন্ধটি তার মধ্যে একটি।

একটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্মকর্তা বলতে আমরা বুঝি মালিক পক্ষের প্রধান ব্যক্তিকে, তিনি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানও হতে পারেন বা নেপথ্য থেকে কোম্পানির প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করতে পারেন। যাহাই হউক মূলত তারই নির্দেশে নিয়োগকৃত পরিচালকমণ্ডলিরা বা বিভাগীয় প্রধানরা প্রতিষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করার স্ব-স্ব-দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এ জন্য কোম্পানি Act-1913 এবং বিভিন্ন সময়ে নেয়া শিল্প আইনও তাকে মেনে চলতে হয়। যিনি গুণগতভাবে পরিবর্তনের প্রত্যাশায় উক্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অতি দক্ষতার সাথে পালন করে থাকেন তিনিই একমাত্র সফল পরিচালক ও ব্যবস্থাপক হিসেবে পরিগণিত হন। একটি ব্যবসায়িক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঠিক উন্নয়ন সম্ভব তখনই, যখন প্রতিটি বিভাগীয় কর্মকর্তারা স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির উর্দ্ধে অবস্থান করে প্রতিষ্ঠানটি সেবার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আন্তরিকতার সাথে সবাই সবার দায়িত্ব পালন করলে একটি শিল্প ইউনিট লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করতে বাধ্য।

প্রবাদ বাক্যের মতো বহুদিন ধরে আমরা একটি কথা শুনে আসছি যে বাঙালিরা বিদেশে গেলে ছোটবড় যে কোন কাজ অত্যন্ত উদ্যমী হয়ে করে থাকেন। অর্থাৎ বিদেশে তারা গাঁধার খাটুনী খাটেন—কিন্তু দেশে থাকলে তারা সেভাবে কাজ করেন না। কাজে প্রচণ্ড ফাঁকি দেন। একজন কোরিয়ান বা জাপানি নিজ দেশে যেভাবে কাজ করেন—বিদেশে গিয়েও তারা ঠিক সেভাবেই দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু বাঙালির ক্ষেত্রে দুই রকম হওয়ার মূলগত কারণ মনে হয় একটি তাহল 'সিস্টেম'। ঐ সমস্ত দেশে কাজ আদায় করার কতগুলো প্রশাসনিক কৌশলগত নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। ঘড়ির কাঁটার মতো ঐ

www.pathagar.com

নিয়মসমূহ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে একজন ক্লিনারকেও একইভাবে মেনে চলতে হয়। এ জন্য বাঙালির দোষ নয়। দোষ সিস্টেমের। আমাদের দেশে সে রকম কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে বটে কিন্তু যারা এই নিয়ম-পদ্ধতিগুলি তৈরি করেন তারাই তা প্রথম ভঙ্গ করেন। আমলাতান্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে সেই প্রশাসনিক পদ্ধতিগুলো তখন আর গতিশীলতায় রূপ নেয় না। যিনি আইন তৈরি করেন তিনি যদি সেই আইনটি না মানেন তাহলে অধীনস্থরা মানবে কিভাবে?

উল্লেখ্য যে দেশের বড় বড় অর্থ জালিয়াতিগুলি বেশির ভাগই উর্দ্ধতন কর্মকর্তারাই করেছেন দৈনিক পত্রিকায় এ ধরনের খবর প্রতিদিন প্রকাশ হচ্ছে যার নেপথ্যে উর্দ্ধতন কর্মকর্তারাই জড়িত রয়েছেন। দ্বিতীয় কারণটি হলো— শিল্প উন্নয়ন দেশগুলিতে কাজের একটি সুন্দর পরিবেশ বিদ্যমানসহ কাজের যথার্থ মূল্যায়ন (পদোন্নতি ও পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে) যথাসময়ে হয়ে থাকে। যার কারণে কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রশ্নই উঠেনা। আমাদের এখানে কাজের পরিবেশ যেমন অস্বাস্থ্যকর তেমনি কাজের মূল্যায়ন হয় খুব ধীর গতিতে। বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে পদন্নোতির জন্য ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা নেয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। এগুলো কর্মকর্তার ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে। উল্লেখিত কারণে একজন নিষ্ঠাবান কর্মচারী সহসা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ফলে কাজের উদ্দোমতা সে হারিয়ে ফেলে।

আমার এক নিকট আত্মীয় সাউথ কুরিয়ায় তার ৬ বছরের চাকরি শেষে সম্প্রতি আমার বাসায় এক পারিবারিক অনুষ্ঠানে এসেছিল। কুরিয়ার পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু ঘটনা তার কাছ থেকে শুনেছিলাম। ওরা কাজ ছাড়া কিছুই বুঝে না। কাজের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে ওদের পদন্নতি ঘটে। তোষণ নীতি বা আত্মীয়র দোহাই দিয়ে কোন কিছু করার সুযোগ নেই। সাধারণ কর্মচারীর মত মালিকের ছেলেও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে। মালিকও নিজের অফিস কক্ষ থেকে শুরু করে ফাইল সংক্রান্ত কাজ পর্যন্ত নিজে করেন। ঐ সমস্ত দেশে উড়ে এসে জুড়ে কেউ বসেনি। খবরদারি বা অন্যের কাজের উপর মাতব্বরী করার কোন সুযোগ নেই। কারণ কাজ ভাগ করে দেয়া থাকে। যার যার কাজের জন্য নিজেকে জবাবদিহি করতে হয় বিধায় সবাই নিজ নিজ কাজ যথাসময়ে সুসম্পন্ন করে থাকে।

একজন শ্রমজীবী মানুষ প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের যে কোন দেশে আনুমানিক ১০ বছর কাজ করলে যে টাকা বিনিয়োগ করতে পারে বাংলাদেশে ২০ বছর সৎভাবে কাজ করলে তার ১/৪ অংশও সে তার পরিবারের জন্য চাকরি সমাপ্তিকালে রেখে যেতে পারেনা। দেশে ও বিদেশে কাজের উদ্দোমতার এই হ্রাস বৃদ্ধির মূল কারণ মনে হয় এটি। এ সমস্ত ভুল ব্যাখ্যা misinterpretation রোধ করার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে।

www.pathagar.com

'Democracy' র প্রথম বাক্যটি হলো মানুষের মতামতকে মূল্য দেয়া, (সে যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন) শ্রদ্ধা করা, অন্যরা কি বলে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা, কিন্তু Democracy -র এই নীতি বাক্যটি যেমন রাজনীতি থেকে উদাও হয়ে গেছে তেমনি কর্ম প্রতিষ্ঠান থেকেও উদাও হয়ে গেছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে বহাল ব্যক্তিটি থেকে শুরু করে অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তার গণতন্ত্রের প্রতি নিম্নতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে দেশের আজকের এই পরিস্থিতি বিরাজ করতো না।

কিছু কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা ভাবেন—তিনি নিজেই সব কাজের কাজী। তিনি ভাবেন তিনি যে কাজটি করছেন সবটাই ত্রুটিমুক্ত। নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে তার পরিকল্পনাটি এবং সবাইকে তিনি যে কাজটি করছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জোর প্রচেষ্টা চালান। এ ধরনের কিছু একরোখা সিদ্ধান্ত (যা অনেকটা অমূলক ও মনগড়া ভিত্তির উপর নির্মিত) আমরা অতীতে এবং বর্তমান সরকারের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি অর্থাৎ বিরোধী দলের সাথে আলোচনা না করে রাষ্ট্রের বড় বড় সিদ্ধান্তসমূহ এককভাবে গ্রহণ করার ফলে দেশ ও জাতিকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই অনিয়ম চলছে।

Management এর সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যদি অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তার সাথে মতামত বিনিময় না করে এককভাবে নিজের নেয়া Decision টি অন্যের উপর চাপিয়ে দেন তখনই গোলমালটা বেঁধে যায়। অর্থাৎ তিনি যা না, তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন তখনই গোলমালের সূত্রপাত ঘটে। জাতীয় সংসদে যেমন আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তেমনি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিচালক মণ্ডলী বোর্ড মিটিং-এর মাধ্যমে কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ পলিসি নির্ধারণ করা হয়। এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সেখানে বিপদের আশঙ্কা বেশি থাকে, এবং সমালোচনার ঝড় ওঠে। সুতরাং শিল্পের স্বার্থে কোম্পানির সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটিরও উচিত হবে না এধরনের কাজে কাউকে উৎসাহ প্রদান করা।

একজন মানুষ সব বিদ্যায় পারদর্শী অর্জন করতে পারেনা। শুধু ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মহামানব ছাড়া অন্য কেউ এই দাবি পোষণ করলে তাকে হেমায়েতপুরে পাঠানোর জন্য মানসিক ডাক্তাররা প্রেসক্রাইভ করে থাকেন। সুতরাং আমরা কেউ ত্রুটির উর্দ্ধে নই, সর্ব বিষয়ে পণ্ডিতও নই সেহেতু সম্মিলিত বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। এতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সভ্যতার আদি যুগ থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। আমরা কেউ যদি এর বিপরীতমুখী আচরণ করি তাহলে ঠকতে হবে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি স্তরে আপার লেবেলের কিছু কর্মকর্তা নিজেদের ভালমন্দ সব কাজের জন্য কিছু চামচা পোষেণ। তিনি মন্ত্রীও হতে পারেন, সি বি এ এর একজন নেতাও হতে পারেন। অধিনস্ত কর্মচারীও হতে

www.pathagar.com

পারেন। তারা উভয়েই কর্মকর্তার খেদমতে জগৎসেটের ভূমিকা নিয়ে বিচরণ করেন। কর্মকর্তারা এদের বাড়তি সুযোগ সুবিধাও দিয়ে থাকেন। গ্রামের এক শ্রেণীর মাতব্বর যাই করে বা বলে, চামচা তাতেই বলে হুজুর যখন বলেছেন তখন কি ঠিক না হয়ে পারে। অফিসের কিছু কিছু কর্মকর্তা মনের মধ্যে এই ধারণাও পোষণ করেন যেমন সবাই আমাকে সমীহ করে চলছে কিনা, আমার প্রশংসা করছে কিনা, আমার জন্মদিনে বা পরিবারের কোন সদস্যের জন্মদিনে উপঢৌকন নিয়ে যথাসময়ে হাজির হয়েছে কিনা। ভাল হউক মন্দ হউক আমি যে কাজটি করছি তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে কিনা, ভাবখানা অনেকটা এরকম What I say and what I do that is right। অন্যদিকে কর্মকর্তা যাকে পছন্দ করেন তার যত ত্রুটিই থাকুক না কেন তার সাত খুন মাপ, আর যাকে পছন্দ করেন না তার যত Quality থাকুক না কেন—পায়ে পায়ে তার দোষ অন্বেষণ করেন তাকে কাছে ঘেষতে দেন না। ভাবখানা অনেকটা এরকম সবদোষ নন্দ ঘোষের। কিছু কিছু বিভাগীয় কর্মকর্তা চামচাদের কান কথায় বিশ্বাস করেন। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা তখন জিম্মি থাকে চামচাদের হেফাজতে। এ সমস্ত কারণে অফিস আর অফিস থাকেনা তখন অফিস দলাদলি, রেষারেষী ও কোন্দলের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। আমি নিজের জন্য যে রকম পছন্দ করি, অন্যের বেলায় তদ্রূপ করি কিনা তাও একজন বিভাগীয় কর্মকর্তাকে ভাবতে হবে। কাজের একটি চমৎকার পরিবেশ নিজের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি সহকর্মী ও অধীনস্ত কর্মচারীদের জন্যও প্রয়োজন। মূলত Table work তারাই বেশি করছে। কাজ আদায় করে নিতে হলে সুন্দর একটি পরিবেশে সবাইকে সমানভাবে ব্যবস্থা করে দেয়ার দায়িত্ব বিভাগীয় কর্মকর্তার। কাজের পূর্বশর্ত হলো শ্রুতিমধুর ব্যবহার, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস। এগুলো যাতে কোন ক্রমেই হারিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কর্তাব্যক্তিদের এবং কর্মচারীদেরও।

আমরা যে স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে উঠে কোন কর্মসাধন করতে আপারগতার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ ওয়াজেদ সাহেব এভাবে, বি টি বি এক সময় ছিল সাহেব বিবি গোলামের বাক্স। পরবর্তীতে হয়েছে বিবি গোলামের বাক্স, আর এখন হয়েছে বাপবেটির বাক্স। সে জন্য রেডিও-টিভি না দেখে পত্রিকা পড়া অনেক ভাল বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বেতার-টিভিতে যারা কাজ করেন তারা মুক্তচিন্তার চেয়ে একটি দলের মোসাহেবী করতে বেশি পছন্দ করেন। এটা অতীতেও ছিল এখনো আছে। শুধু দল নয় সর্বস্তরে এই অনিয়ম নিয়মে পরিণত হয়েছে। সভ্য সমাজে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এ ধরনের কাণ্ড কারখানা করলে তাকে পেনাল্টি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে সাজা হয়, চাকরিও হারাতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রমোশন হয় বাড়তি আয়ের রাস্তা খুলে যায়। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় কর্মকর্তারা সাধারণ কর্মচারীদের সাথে মধ্যযুগের কৃতদাসের মতো ব্যবহার করেন। মনে হয় কর্মচারীটি তার কেনা গোলাম। বাসার চাকরদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেন কর্মচারীদের সাথে অনেকে সেই ভাবেই আচার-ব্যবহার করেন। তিনিও

www.pathagar.com

যে ছোট থেকে বড় হয়েছেন এ কথা তখন বেমালুম ভুলে যান। পারিবারিক ও কর্মজীবনে এধরনের আচরণ মানবিক আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত।

বিদেশে শ্রমিক আর মালিক একই সাথে ছোট বড় সব কাজ করছেন। কে বড় কে ছোট এগুলো তারা চিন্তার মধ্যে আনেন না। সবাই সবাইকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। পদ্ধতিটাকেই মুখ্য বলে মনে করেন বলেই তারা একই পরিবারের সদস্যর মতো মিলে মিশে কাজ করেন। এ কারণে কোন দলাদলি হানাহানি সংঘাতের সৃষ্টি হয় না অফিস প্রাঙ্গণে।

এক জায়গায় আমরা বেশি ভুল করে ফেলি—সেটি হলো সকল মানুষের চরিত্র একই রকম হয় না এ কথাটি আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনা। স্বভাব বা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একেক জন মানুষ একেক রকম হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা যে পরিবেশে তিনি বড় হয়েছেন সেই পারিপার্শ্বিকতার কারণে অনেক মানুষকে কখনো Extrovert বা বহির্মুখী প্রকৃতির সদা চটপটে হতে দেখা যায়। আবার কখনো বা অনেক মানুষকে তার উল্টোটি অর্থাৎ Introvert বা অন্তর্মুখী প্রকৃতির চুপচাপ থাকতে দেখা যায়। Logically আচার আচরণে বেশি চটপটে বা Over Smart হওয়া যেমন ঠিক নয়। বেশি চুপচাপ থাকাটাও তেমন গ্রহণযোগ্য নয়। মধ্যম পন্থাই সবচেয়ে উত্তম পন্থা। ইসলামও এই পন্থাটিকে সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিয়েছে।

যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সব মানুষকে সর্বদা সদালাপি হতে হবে, এবং ব্যবহারে অহংবোধ প্রকাশ হতে পারবে না। কথায় আছে Courtesy pays a lot but costs nothing অর্থাৎ ভদ্রব্যবহার একজনকে অনেক কিছুই দিতে পারে। বিনিময়ে তাকে কিছুই খরচ করতে হয় না। কিন্তু অতি আলাপ অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়। তাই আলাপ সংক্ষেপ করাই উত্তম। আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ তাই আর্থিক, সামাজিক বা পেশাগত মানদণ্ডে যত ক্ষুদ্র স্থানেই তার অবস্থান হউক না কেন প্রত্যেক মানুষ তার নিজ নিজ পরিমণ্ডলে একজন বিশেষ ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় অথবা স্নেহাস্পদ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। এজন্য তাকে মহত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

আমরা যে যেখানে যে অবস্থানে বসে কার্য পরিচালনা করি না কেন এবং সেটা যত বড় বা ক্ষুদ্র হউক না কেন সবাইকে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই কর্ম প্রতিষ্ঠানটি একটি মডেলে রূপ নিবে। ৬৮ হাজার গ্রামে সেটি তখন একটি অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে উল্লেখিত আলোকে সাজানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাই।

স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য

'স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য'। স্লোগানধর্মী এই কথাটি শুনতে বেশ ভাল লাগে। কিন্তু বাস্তবে কি আমরা সবাই এর প্রতিফলন দৈনন্দিন জীবনে ঘটাই? সাধারণভাবে দেশীয়

www.pathagar.com

পণ্য বলতে আমরা দেশের তৈরি ও উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীকেই বুঝি। দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভর করে স্বদেশী তৈরি পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমেই। দেশের সম্পদ অপচয়, অপব্যবহার, চোরাই পথে দেশের বাইরে পাচার এবং দেশীয় পণ্য অবহেলা করে দেশ ও জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি করছি? আমরাই কিন্তু একদিন বলেছিলাম, বিদেশী পণ্য বর্জন কর, সম্পদ পাচার হয়ে যাচ্ছে, অনুৎপাদন খাতে ব্যয় রোধ কর। দুঃখের সাথে আজ বলতে হচ্ছে, আমরাই আজ কেউ কেউ সম্পদ অপচয় ও পাচার করছি এবং দেশীয় পণ্যের স্থলে বিদেশী পণ্য ব্যবহার করে বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছি।

বিদেশ থেকে আসা পণ্য, চোরাই পথে আসা পণ্য বাংলাদেশের নিজস্ব বাজারগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। আমরাই গিন্নির জন্য শাড়ি কিনতে গেলে প্রথমেই দোকানীকে বলি ভারতীয় শাড়ি আছে কিনা, অথচ ভারতীয়রা পর্যন্ত স্বীকার করেছে বাংলাদেশের শাড়ি ভারতের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। আমরা আজ স্বদেশী পণ্যের কথা জোর গলায় বলি অথচ একবারও কি ভেবে দেখেছি যে, আমাদের ব্যবহৃত দ্রব্যগুলো বাংলাদেশের তৈরি কি না। ভাবতে অবাক লাগে স্বাধীনতার ৩০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ এখনও অফিস আদালতে সাধারণ কাজকর্ম ও লেখার সামগ্রীগুলো বিদেশী তৈরি ব্যবহার করতে হয়। ছোট একটি আলপিন, জেম্‌স ক্লিপ, এমনকি সুঁই পর্যন্ত বিদেশি ব্যবহার করতে হয়। বাচ্চাদের বিদেশী তৈরি পুতুল, খেলার সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে বিদেশী টিনজাত খাদ্য ও ফলজাত দ্রব্যে বর্তমান বাজার ছেয়ে গেছে। দুধের কথা মনে পড়লো, আমাদের শিশুদের মায়েরা আজকাল বাজারের বিদেশী শিশু খাদ্যের উপর বেশি মাত্রায় নির্ভর করছে। এতে নাকি প্রোটিন বেশি। যেখানে দেশের উন্নতমানের দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন হচ্ছে সেখানে দুগ্ধজাত দ্রব্য আমদানি করে বহু বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করার কোন অর্থ হয় না। দুঃখ লাগে শুনতে যে, আমাদের টাকায় আজ বিদেশীদের ডেয়ারী ফার্ম চলছে। এ ব্যাপারে সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে, সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন প্রচার মাধ্যমগুলো যাতে বিদেশী দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেশীয় দুধের উৎপাদন বাড়িয়ে তা বাজারজাত করার সুযোগ সৃষ্টির কাজে সহায়তা করে।

কিভাবে আমরা দেশীয় পণ্য থাকা সত্ত্বেও বিদেশী পণ্য ব্যবহার করছি তার দিকে আর একটু ফিরে তাকাই। এক্ষেত্রে আমাদের দেশীয় ফল ও শাক-সবজির কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশীয় ফল-মূল বিদেশের তুলনায় কোন অংশে পুষ্টিকর কম নয়। যেমন ধরুন একটি পেয়ারায় কয়েকটি আপেলের সমপরিমাণ ভিটামিন বিদ্যমান। তদ্রূপ কমলা, আমলোকি, আম, জাম, কলা, পেঁপে, গাজর পুষ্টিকর সুষম খাদ্য। আখের রস ও ডাবের পানি পেটের পীড়ার জন্য খুবই ভাল পথ্য আমরা অনেকেই বুঝি না বিধায় বাজার থেকে রোগীদের জন্য বা নিজেদের ব্যবহারের জন্য বিদেশী ফল কিনে নিয়ে যাই। তাছাড়া, বিভিন্ন মৌসুমী শাক-সবজি, টমেটো, মটর-শুটি, কপি, শালগম ইত্যাদি ছাড়াও অনেক

www.pathagar.com

উৎকৃষ্ট ও ভিটামিনসমৃদ্ধ শাক-সবজি রয়েছে। কথাগুলি আমার নয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের কথা। সত্যি বলতে কি, আমাদের দেশের ফল ও শাক-সবজি আজ আরব বিশ্বে যথেষ্ট সমাদর ও চাহিদা রয়েছে। এই ধরনের দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে একদিকে আমরা বহু বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। অন্যদিকে আমরা নিজের দেশের ও বিদেশী বাজারের চাহিদা পূরণ করতে পারি।

আগে দেখেছি এবং শুনেছি, বিয়েতে বউ সাজিয়ে দিত দেশীয় পণ্যে অর্থাৎ গায়ে হলুদ, হাতে-পায়ে মেহেদীর রঙ লাগিয়ে এবং বিনি সুতার মালা পরিয়ে দেশীয় ভাবধারায় বিয়ে দিত। আর এখন সেখানে বিউটি পারলারে গিয়ে পাশ্চাত্য কায়দায় বর ও কনে সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়। অনেকে আবার বিয়ের অনুষ্ঠান ও খাওয়ার পর্বটাও সেরে ফেলে কোন বিলাসবহুল হোটেল বা চায়নিজ রেস্তোরাঁয়। এগুলি নাকি আজ আভিজাত্যের প্রকাশ। বাজারে আজ বিদেশি খাদ্য ও প্রসাধনীর ছড়াছড়ি, এভাবে বিদেশী পণ্য আমদানি করে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় করা হচ্ছে।

রাজধানীর অভিজাত এলাকার আবাসিক স্থানগুলোতে আজ অনেক শপিং মল গড়ে উঠেছে। এসব শপিং সেন্টারগুলিতে দেশী পণ্য যত না আছে তার চেয়ে বেশি রয়েছে বিদেশী পণ্য। বনানী, গুলশান, ধানমণ্ডী এবং হালে গড়ে উঠা উত্তরার মডেল শহরে এই সমস্ত বিদেশী পণ্যের বহুতলবিশিষ্ট শপিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বিদেশী দূতাবাস, সংস্থা ও বিদেশী মিশনগুলি এসব এলাকায় অবস্থিত। হাত বাড়ালেই বিদেশীরা পেয়ে যান তাদের নিজ নিজ দেশের তৈরি পণ্যসামগ্রী। জাপান থেকে আরম্ভ করে চীন, কোরিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ইউ এস এ, সিংগাপুর, তাইওয়ান, প্যারিস এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যসামগ্রীসহ বিদেশী পণ্যের কোন অভাব পরিলক্ষিত হবে না শপিং সেন্টারগুলোতে। কিন্তু অবাক লাগে যখন শুনি আমাদের দেশের তৈরি পণ্য বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী ভাইরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও খুঁজে পান না। এমনি ধরনের একটি করুণ আক্ষেপের কথা আমার এক পরিচিতজন থেকে শুনেছি, যিনি বহু বছর থেকে বিদেশে চাকরি করছেন। সবচেয়ে দুঃখ লাগে যখন দেখি বিদেশীরা ভিন্ন দেশে গিয়েও তাদের দেশীয় ভাব-ধারা, পোশাক-পরিচ্ছদে, চালচলনে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে বজায় রেখে চলছেন। এভাবে তারা বিদেশে অবস্থান করেও দেশের পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে থাকেন। অথচ আমরা যারা বহিঃবিশ্বে এবং দেশে অবস্থিত বিদেশী মিশন ও সংস্থায় চাকরি করছি, তাদের অনেকেই স্বদেশী ভাবধারা বজায় না রেখে বিদেশীদের রীতিনীতি ও চালচলনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি এবং সেটা করছি বিদেশী পণ্য ব্যবহারের মাধ্যমে।

কাথাটি যদিও শুনতে খারাপ লাগে কিন্তু রূঢ় বাস্তব। যেখানে বিশ্বের প্রায় দেশেই জাতীয় পোশাক রয়েছে সেখানে সরকার কর্তৃক ঘোষিত আমাদের কোন জাতীয় পোশাক না থাকায় এহেন অপব্যয় আরও বেশি করে ঘটছে।

www.pathagar.com

বিগত ৩০ বছর ধরে আমরা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে চলছি। আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা এবং দেশীয় শিল্প বিকাশ ও শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি আমরা তত মনোযোগী হইনি। ফলে আজ বৈদেশিক বাণিজ্যে বিরাট ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। রপ্তানি বাণিজ্যে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তার দ্বিগুণেরও বেশি ব্যয় হয় আমদানি বাণিজ্যে। সোজা কথায় রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি। বৈদেশিক ঋণের বোঝা নিয়ে দেশ চলছে। মাথা পিছু ঋণ ৬০০০ টাকা। সুদে-আসলে সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করা আমাদের মত গরিব দেশের পক্ষে কত যে কষ্টসাধ্য তা বলে বুঝানো যাবে না। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই বিরাট ব্যবধান রোধ করা প্রয়োজন। অন্যদিকে আমদানিকৃত পণ্যের উপর কোটি কোটি টাকার কর বসিয়ে দেশকে মুদ্রাস্ফীতির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ফলে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে আরো দ্রুত গতিতে। বর্তমানে আশু প্রয়োজন রপ্তানি আয় বাড়ানো এবং এই আয় বাড়াতে হলে প্রথমে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। সাথে সাথে রপ্তানি পণ্যের গুণগত মানও বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যদিকে আমরা আমদানির বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করেও উৎপাদন বাড়াতে পারি।

সরকার দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দেশীয় পণ্য যাতে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করার আগ্রহ জন্মে তার জন্য সরকার কিছু ভালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। ওষুধনীতি তার মধ্যে একটি। শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ সম্প্রসারণ লক্ষ্যে শিল্প ফোরাম '৮৭ গঠিত হয়েছে। "কুটিরশিল্প" পণ্যের রপ্তানি মেলা, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার এবং ওসমানী মিলনায়তনে বিসিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের বাজার সৃষ্টির পথ সুগম করেছেন। সরকার বিদেশী বাজার সৃষ্টির জন্য দেশীয় পণ্য রপ্তানিকারকদের পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। সরকার দেশের অবহেলিত এলাকায় শিল্পায়ন হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন। দুই হাজার সালের মধ্যে ২২টি শিল্প নগরী গড়ে তোলা এবং ৪০৭টি উপজেলাকে শিল্পায়িত করা সরকারের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করেছেন। এছাড়া দেশবাসীর কাছে সরকার বেশি বেশি স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্য বাড়ানো এবং দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যেই এগুলো সরকার গ্রহণ করেছেন। এখন স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে সচেতন হতে হবে আমাদের।

দেশ পরিচালনায় যারা রয়েছেন তাদের কাছে দেশীয় পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের আরও কিছু আবেদন রয়েছে, তা হলো ঃ

১। যে সমস্ত পণ্য দেশের মানুষ শ্রম দিয়ে উৎপাদন করতে পারে সেখানে বহিঃবিশ্ব থেকে বিদেশী অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞ আমদানি করার প্রয়োজন নাই। এর পিছনে অর্থ ব্যয় করা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। আমাদের পুঁজি যেমন সীমিত, তদ্রূপ ভৌগোলিক এলাকাও সীমিত কিন্তু জনশক্তি প্রচুর। তাই শ্রমভিত্তিক শিল্প ইউনিট বিশেষ করে কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি

www.pathagar.com

শিল্প গড়ে তোলাই আমাদের মত গরিব দেশের জন্য মঙ্গলজনক।

৩। শিল্প বিকাশ ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যাংক ঋণ বাড়াতে হবে। পুঁজি বিনিয়োগ উৎসাহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ ব্যাংক গঠন করতে হবে। অনুন্নত এলাকায় শিল্প বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ট্যাক্স হলিডের সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়াতে হবে।

৪। যে সমস্ত কাঁচামাল ব্যয় সাপেক্ষে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় সেগুলো যাতে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন করা যায় সরকারের সেই গবেষণা চালানো উচিত।

৫। বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার বন্ধ করে দেশীয় পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে তার প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং পণ্য মূল্য জাতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তার জন্য সরকারের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। সোজা কথায় দেশীয় পণ্য ব্যবহার করার মত একটি সুন্দর ও বাস্তবধর্মী পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত।

৬। দেশীয় পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রথমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে হবে। প্রথমে দেশীয় বাজার, পরে বিদেশী বাজার। পণ্য উদ্বৃত্ত থাকলে রপ্তানি করতে হবে, এতে অহেতুক পণ্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে গোটা জাতি রেহাই পাবে।

৭। পরিশেষে বলতে চাই জাতির বৃহত্তর স্বার্থে, এ ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় করণীয় কাজটি হলো বিজাতীয় ও ঔপনিবেশিক চিন্তাধারা মন থেকে চিরতরে ধুয়ে মুছে ফেলতে হবে। যেমন—অনুকরণ, নকল, বা বিদেশী প্রতিটি জিনিস উত্তম—এ ধরনের বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা ত্যাগ করে স্বদেশী পণ্য বেশি বেশি ব্যবহার করার মন মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। তবেই আমরা দেশ ও জাতি হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো এবং দেশও সত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ফিরে পাবে, এবং মুক্ত বাজার বিশ্বেও আমরা টিকে থাকতে পারবো।

দক্ষ ব্যবস্থাপনাই শিল্প উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে

বাংলাদেশের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এখনো মান্ধাতার আমলের নিয়ম-কানুন চালু রয়েছে। হিসাব-নিকাশের পদ্ধতিও সেকেলের রয়ে গেছে। ফলশ্রুতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের রেল গাড়ির প্যাসেঞ্জার হতে আমরা বার বার ব্যর্থ হয়েছি। আমি ব্যক্তিগত উদ্যোগে সার্ভে করেছি এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের নমুনা এখানে উল্লেখ করবো যাতে সুধী পাঠকসমাজ অনুধাবন করতে পারেন—অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে আমাদের প্রতিবন্ধকগুলো কোথায়?

পৃথিবীর যে কয়টি দেশ শিল্প ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছেন তার নেপথ্য কারণ ছিল স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের দক্ষ ব্যবস্থাপনা। "বিজ্ঞানভিত্তিক পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনাই" একটি প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে। শুধু ফ্যাক্স, ই-মেইল টেলিপ্রিন্টার এবং কম্পিউটার নয়, বিজ্ঞানের লেটেস্ট প্রযুক্তিটি পর্যন্ত উন্নত বিশ্ব ব্যবহার করার জন্য আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। খুব সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে শিল্পপণ্য

www.pathagar.com

কনজিউমারের হাতে পৌঁছে দেয়া যায় তার সকল ব্যবস্থাও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সুসম্পন্ন করছে। বিদেশী "অর্থনৈতিক সাময়িকীগুলোতে" চলতি বছরে (১৯৯৯ইং) যে কয়টি নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় দক্ষ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এশিয়ান দেশসমূহের মধ্যে জাপানের অবস্থান সবার শীর্ষে। দক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই তাদের শিল্পপণ্য বিশ্ববাজার দখল করতে পেরেছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে আমাদের দেশে হাতে গোনা কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া এখনো অগণিত প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু হয়নি। সেকেলের টাইপ এবং ক্যালকুলেটিং মেশিনের মাধ্যমেই শিল্প ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করা হচ্ছে যা এখন আধুনিক বিশ্বে অচল বস্তু। উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় দেশে বিক্রয় পদ্ধতি চলছে, মানি লিং (এ, এম টি) ক্রেডিট কার্ড ও কম্পিউটারের মাধ্যমে। নগদ টাকা নিয়ে মুভ করা বিপদজনক বিধায় এ সমস্ত সিস্টেম চালু হয়েছে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে। কিন্তু দুঃখজনক যে বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের এখনো ছাপানো ইনভয়েসের মাধ্যমে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লেটার প্যাডে পণ্য সামগ্রীর নাম লিপিবদ্ধ করে মাল কেনাবেচা চলছে যা সময় সাপেক্ষ তো বটেই দেখতেও অস্পষ্ট এবং অসুন্দর দেখায়। এতে যেমন প্রতিষ্ঠানেরও সার্বিক সৌন্দর্যের ব্যাঘাত ঘটে তেমনি ক্রেতাদের কাছে উক্ত কোম্পানির পণ্যসামগ্রীর চাহিদাও ব্যাপক হারে হ্রাস পায়। মূলত একটি ভুলের জন্য বিভিন্নভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়। একটি Skill Management-এর অভাবহেতু এ ধরনের আরো বহু ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales representative) চটপটে এবং প্রাণবন্ত স্বভাবের হয়ে থাকে সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রীর চাহিদাও বাজারে বেশি থাকে। সুতরাং বিক্রয় প্রতিনিধি নির্বাচনে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তার মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান অর্থাৎ Inter relation যত মজবুত হয় সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে Teamwise work speed অনেক বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে Production and salef growth দুটোই আনুপাতিক হারে বেড়ে যায়, এবং প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দুঃখজনক যে একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবহেতু দেশের প্রায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বজনপ্রীতি এবং দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে একটি প্রতিষ্ঠানের সকল, কর্মচারীই এক মায়ের সন্তান হিসেবে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ যে ভালভাবে কাজ করবে তার পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং যে নিয়ম বহির্ভূত কাজ করবে তার শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে খুব কমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম চালু রয়েছে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় কোম্পানির সার্বিক উন্নতির চেয়ে কর্মকর্তার ব্যক্তিগত উন্নয়নে সময়ক্ষেপণ করে অনেকেই ফায়দা লুটে নিচ্ছেন। উদ্দেশ্য হতে হবে কোম্পানির উন্নতি, ব্যক্তির নয় কিন্তু আমাদের দেশে এই নিয়মটি শক্ত শেকড়ের রূপ নিতে পারেনি বিধায় আমরা এখনো

www.pathagar.com

শিল্পে বহু পিছনে রয়ে গেছি। দেশে শিল্প বিপ্লব ঘটাতে না পারলে অভাব কখনো মোচন হবে না।

সম্প্রতি আমার বেক্সিমকো, মনু, পারটেক্স, বেঙ্গল ফাইন, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল এবং বীমা কোম্পানির ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কারিগরি দিক দেখার সুযোগ ঘটেছিল। বর্তমানে এ সমস্ত দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একমাত্র বেক্সিমকো গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে আধুনিক ব্যবস্থাপনার কিছুটা ছোঁয়া লেগেছে বলা যায়। দেশে অবস্থিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলগুলো তারা অনেকটা আয়ত্ত করতে পেরেছেন বিধায় তাদের পণ্যসামগ্রীর চাহিদা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। দক্ষতা এবং রুচিশীলতার ছাপ শুধু ব্যবস্থাপনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় গোটা প্রতিষ্ঠানের বিল্ডিংয়ের মধ্যেও এর ছিটেফোঁটা নমুনা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

পৃথিবীর বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসিক "ডেল কার্নেগী" তার একটি গ্রন্থে লিখেছেন অফিসের পরিবেশ যদি স্বাস্থ্যসম্মত না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরাও সুস্থভাবে তাদের দৈনন্দিন কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবে না। সুতরাং কাজের পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে অফিস কক্ষসমূহ অহেতুক জঞ্জালে পরিণত না হয়। এটা দেখার বিষয় কোম্পানির ব্যবস্থাপনার। কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় যারা থাকবেন তাদের আরেকটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন তাহলো কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অফিসার্স গ্রেডে মাঝে মধ্যে 'Management Skill Programme'-এর আওতায় বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। একটি সৎ এবং ত্রুটিমুক্ত Management শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নয় গোটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে এর যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

ইদানীং দেশের চলমান রাজনীতির কিছু প্রভাব শিল্প প্রতিষ্ঠানেও পড়েছে। দলীয় মতাদর্শ প্রচারে এরা সময় ক্ষেপণ করে থাকেন। বহু প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা নিজ নিজ দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহর সার্বিক ভাবমূর্তি জাতীয়ভাবে বিনষ্ট করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। ব্যক্তি, দল অর্থাৎ সবার উর্ধ্বে আমার দেশ, সুতরাং জাতীয় সম্পদই হতে হবে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। কিন্তু তা হচ্ছে না। আমরা মনে করি দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কাজ করা উচিত। একটি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দল ও মতের লোক থাকে। সুতরাং প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি দলীয়করণের আওতায় আবদ্ধ করা হয় তাহলে কাজের পরিবেশ যেমন বিনষ্ট হবে তেমনি প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে না। কারণ দলের লোকরাই প্রতিষ্ঠানটিকে লুটপাটের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে যা এখন দেশে হচ্ছে। দেশের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপ দেয়ার লক্ষ্যে দল ও মতের উর্ধ্বে উঠে কাজ করে যাওয়াটাই একটি দক্ষ ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব। আমাদের দেশে কোন দল ক্ষমতায় আসলে সেই দলের সমর্থকদের চাকরি এবং সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়। এতে দেখা যায়, যে লোকের চাকরির যোগ্যতা রয়েছে সে লোক চাকরি পেল না। এমন একজন ব্যক্তি চাকরি পেল যার উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। নেই Professional কোন অভিজ্ঞতা এর ফলে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারছে না। অযোগ্য লোক নিয়োগের কারণেই এমনটি ঘটছে।

কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি তার উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করতে না পারেন তাহলে ভোক্তাদের কাছে উক্ত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন হ্রাস পাবে। দেশের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে যার নিজস্ব কোন Quality Control Department নেই। দেশে যে কয়টি Testing Laboratory রয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয়। যে কয়টি Testing Laboratory রয়েছে, সেখানে প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে কিনা তারও কোন তদারকীর ব্যবস্থা রয়েছে বলে মনে হয় না।

বর্তমান যুগ মিডিয়ার যুগ, যে কোম্পানির পণ্য সামগ্রীর প্রচার যত বেশি চালানো যাবে সেই কোম্পানি বছরান্তে তাদের বিক্রয় টার্গেট পূরণ করতে সক্ষম হবে। অনেক ক্ষেত্রে বিক্রয় বাড়ানোর জন্য revise budget তৈরি করা হয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মিডিয়ার বাহনগুলোকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে হবে। ত্বরিৎগতিতে পণ্যসামগ্রীর সংবাদ পৌঁছানোর জন্য পর্যাপ্ত টেলিফোনের আধুনিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদেশে সংবাদ দ্রুত পৌঁছানোর জন্য ফ্যাক্স ও আধুনিক টেলিপ্রিন্টারের ব্যবস্থা কোম্পানির নিজস্ব বিল্ডিংয়েই থাকতে হবে। "স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য" প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যটি জাতীয়ভাবে সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং বাক্যটি প্রচারযন্ত্রে নীতিবাক্য হিসেবে প্রতিদিন প্রচার করতে হবে। দেশের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর গুণগতমানসহ নিত্যনতুন রিসার্স প্রোডাক্ট যাতে উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের দক্ষতার উপরই একটি কোম্পানির সর্বোপরি একটি দেশের অর্থনৈতিক রূপরেখা নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

বিশ্বের শিল্পনগরীর বিভিন্ন Departmental Store-এ এখন Computer-এ হিসাব-নিকাশ করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক যে, আমাদের দেশে এখনো বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানে Computer System চালু হয়নি। বিদেশে ছোটখাট দোকানেও Computer চালু হয়েছে, অথচ আমাদের দেশে এখনো ব্যবসায়িক লেনদেন চলছে ছাপানো লেটার প্যাড বা টাইপ মেশিনের মাধ্যমে। পৃথিবী যেখানে ১০০ বছর এগিয়ে গেছে সেখানে ৫৬,০০০ বর্গ মাইলের এই ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট দেশটি ১০০ বছর পিছিয়ে গেছে। কারণ একটি তা হলো 'কথা বেশি কাজ কম'। সবাই আমরা বেশি বুঝি। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানই বলুন আর ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানই বলুন সর্ব অবস্থায় সৎ এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রচণ্ড অভাব। যার কারণে উন্নয়নের রেল গাড়ির প্যাসেঞ্জার হতে আমরা বার বার ব্যর্থ হচ্ছি।

www.pathagar.com

শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমান

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে শিল্পের গুরুত্ব নিয়ে সরকারি-বেসরকারি মহল আজ দেশে একটা আলোচনার ঝড় তুলেছেন, সবাই ভাবছেন বর্তমান সংকট নিরসনে দেশকে শিল্প উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া সমাধানের বিকল্প কোন পথ নেই। মূলত আমাদের দেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। জীবিকা অর্জনের জন্য এখনো অধিকাংশ লোককে নির্ভর করতে হয় কৃষির উপর। অথচ এই কৃষিতেও আমরা স্বনির্ভরতা লাভ করতে পারিনি। ১২ কোটি ৫৫ লাখ লোকের বাস আমাদের এই দেশের মাথা পিছু গড় আয় মাত্র ২৫০ ডলার—একটি দুর্বল অর্থনীতির প্রতীক কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি নিয়ে দেশটি এখনো যথেষ্ট শিল্পায়নের দিকে এগিয়ে যেতে পারেনি। বছরে কোটি কোটি টাকার খাদ্য আমাদের এখনো আমদানি করতে হয়। এমনকি শিল্প পণ্য অর্থাৎ উড়োজাহাজ থেকে আলপিন পর্যন্ত আমাদের আমদানি করতে হয় বিদেশ থেকে। আমরা সবাই জানি পরনির্ভরশীল অর্থনীতি কোন দেশকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে দেয় না। বিলম্বে হলেও সরকার এই কথা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের দেশকে শিল্প উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

বর্তমান দেশের বিপুল পরিমাণ বেকার জনসংখ্যার চাপ ও অর্থনৈতিক মন্দা দূরকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা এবং দেশীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশীয় চাহিদা মিটানোর জন্যই আজ শিল্পের গুরুত্ব বেশি করে দেখা দিয়েছে। শিল্প উন্নয়নের সুন্দর পরিবেশ এবং সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ জনশক্তি, প্রাকৃতিক, কৃষিজাত এবং পর্যাপ্ত পানি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এই দেশটি শিল্প উন্নয়নে আজ বহু পিছনে পরে থাকারও একটি বেদনাদায়ক ইতিহাস রয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পৃষ্ঠ হয়ে যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলের বাসিন্দারা শিক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যেমন পিছনে পড়ে রয়েছিল তদ্রূপ পিছনে পড়ে রয়েছিল অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে মূল ভিত্তি শিল্পের ক্ষেত্রেও। আমরা যখন দুইশত বছর পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ছিলাম তখন থেকেই বাংলা ভাষা-ভাষী অঞ্চলগুলোর মধ্যে পূর্ব বাংলাই ছিল সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও লাঞ্ছিত এবং দারিদ্র্যের সবচেয়ে চরম সীমায় অবস্থান করতে হয়েছিল আমাদের। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে বেশির ভাগই শিল্পকারখানা গড়ে তুলেছিল পশ্চিম বাংলায় এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে। পূর্ব বাংলায় কোন শিল্প কারখানা তেমনটি গড়ে তুলেনি। দুই একটি কল-কারখানা যা ছিল তার মালিক ছিল ভারতীয় বাসিন্দা। দেশ বিভাগের পর তারাও চলে গেল। স্বাভাবিকভাবে নতুন দেশের শিল্প উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে দেখা দিল পুজি সংকট, উদ্যোক্তার সংকট ও বাজার সংকট। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পুঁজিপতি সৃষ্টি রোধ করার উদ্দেশ্য সমাজতান্ত্রিক ধারায় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ঢেউ উঠে এবং

www.pathagar.com

সাবেক সরকার বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোকে জাতীয়করণ করে জাতীয়করণ কর্মসূচির বাস্তব প্রতিফলন ঘটান। এই ব্যাপারে তাদের যুক্তি ছিল প্রতিষ্ঠানের লাভ থেকেই রাষ্ট্রীয় তহবিল বৃদ্ধি করে তা জনগণের স্বার্থেই ব্যবহার করা হবে। এই কথা বলা থাকলেও পরবর্তীকালে কি পরিমাণ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে তা আমাদের কারোই অজানা থাকার কথা নয়। বিগত এরশাদ সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সরকার Investors forum '87 গঠন করেছেন। গত ১৯-২২ জানুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফোরামের সভায় ৪৫০ জন দেশীয় প্রতিনিধিসহ ২৭ টি দেশের ২২৩ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেন। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৫৮ টি। দেশের শিল্প উন্নয়নের খাতে দেশী ও বিদেশী শিল্প উদ্যোক্তাদের পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশের বিভিন্ন দিক নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়। জাতীয় উন্নয়নে শিল্পের অবদান সবচেয়ে বেশি একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত। দেশের মোট জাতীয় আয়ের ১৫% আসছে শিল্প খাত থেকে। বর্তমান শিল্প থেকে আয়ের এই হার অত্যন্ত নগণ্য। তা অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে জাতির একটা বিরাট অংশ যাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় এবং এই শিল্প পণ্যের বিক্রয়লব্ধ আয় দেশকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তজ্জন্য শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

তাই আমাদের বর্তমান শিল্পনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত দেশীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা। দেশীয় শিল্প পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমদানি বাণিজ্যের উপর নির্ভরতা কমিয়ে রপ্তানি বাণিজ্যের উপর জোর দিতে হবে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে শুধু Industry নয় Rapid industry গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সাথে সাথে শিল্প বিকাশ তরান্বিত করার জন্য ব্যাংক ঋণের সুদের হার হ্রাস করতে হবে। শহরের বাইরে Rural এলাকায় শিল্প কারখানা যাতে বেশি করে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য Tax holiday এর সুযোগ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা জানি দেশকে শিল্পায়নের দিকে ধাবিত করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পুঁজির। আমাদের দেশে পুঁজির অপর্যাপ্ততা যথেষ্ট লক্ষণীয়। এর প্রধান কারণ সম্পদের অপচয়। আমাদের মত গরিব দেশে ধনীদের ভোগ বিলাসের মত অনুৎপাদন খাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। সাধারণ রূপচর্চা ও আরাম আয়েশের জন্য এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার কোন মানে হয় না। আজ যদি এই টাকা শিল্প খাতে ব্যয় করা হতো তাহলে আমরা শিল্প ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যেতাম। সরকারের সেজন্য দেশের স্বার্থে সম্পদ অপচয় ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় রোধ করার আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আমাদের দেশের কুটির শিল্প দেশের ঐতিহ্যের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত এবং এই কুটির শিল্প একদিন অর্থনীতিতে বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী শাসক ও শোষকদের কারসাজিতে তা আস্তে আস্তে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর তা আবার কর্ম চাঞ্চল্যের রূপ নেয়। তামা, কাঁসা, ধাতব, কারু, তাঁত, কার্পেট, মৃৎশিল্প এই ধরনের আরো অনেক কুটির শিল্প সামগ্রী আমাদের দেশে তৈরি হয় এবং দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে।

www.pathagar.com

এই সমস্ত পণ্যসামগ্রী আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ও ঐতিহ্যের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাই আমাদের অতীত ঐতিহ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য কুটির শিল্পের উন্নয়নের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত, এতে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, বিদেশী Expart ও Technicians প্রয়োজন হয় না। তাই বৈদেশিক মুদ্রার অপচয়ের ভয় নেই। একমাত্র দেশীয় কাঁচামাল, দেশীয় ঐতিহ্যে এবং দেশীয় শ্রম দিয়েই এই কুটির শিল্প উন্নয়ন সম্ভব। এজন্য শ্রমভিত্তিক শিল্প Uniit গড়ে তোলাই আমাদের মত গরিব দেশের জন্য অত্যন্ত লাভজনক। আমাদের অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আমদানির প্রতিযোগিতায় না নেমে বরং শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে কুটির শিল্প গড়ার উপর নজর দেয়া উচিত সবচেয়ে বেশি। "৬৮ হাজার গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে" এই শ্লোগানমুখর কথাটি বাস্তবে রূপ দিতে হলে গ্রাম পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারতা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এতে একদিকে বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে মানুষের নগরমুখী হওয়ার প্রবণতা কমে যাবে, দ্বিতীয়ত, পণ্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

রফতানিকারকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। শুধু উন্নয়নশীল দেশেই নয় সারা দুনিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রফতানি বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তদ্রূপ আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে, রফতানিকারকরা যাতে করে দেশীয় শিল্প পণ্যের বিদেশী বাজার সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করে, দেশীয় শিল্প বিকাশের পথকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারে সরকারের সেই দিকে নজর দেয়া উচিত। শিল্পের উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারের মাঝে মাঝে শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্প ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদের এবং শিল্প পণ্য রফতানিকারকদের নিয়ে ট্রেনিং, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা উচিত। এতে করে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পের গুরুত্ব যে কত বেশি তা আমরা উপলব্ধি করতে পারব।

উপসংহারে বলবো, কোন ব্যক্তিবিশেষকে নিয়ে দেশ নয়—ব্যক্তি যাবে আর আসবে—কিন্তু দেশ থাকবে। আমরা যে যেখানে যে অবস্থাতে থাকি না কেন দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমাদের দেশকে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলা আমাদেরই কর্তব্য। "স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য" এই শ্লোগানটি আজ অনেকের মুখেই শোনা যায়। আমরা যারা এই সত্য কথাটি বলি তাদের অনেকেই এর বাস্তব প্রতিফলন নিজেদের ক্ষেত্রে ঘটাই না, আমাদের গৃহ সামগ্রী থেকে আরম্ভ করে নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি বাংলাদেশী তৈরি কি-না তাও ভেবে দেখার বিষয়। জাতীয়তাবাদের কথা আজ আমরা যারা বলছি—নিছক এটা একটা শ্লোগান ছাড়া আর কিছুই নয়। এর সত্যিকার অর্থ আমরা এখনো অনেকেই বুঝি না বলেই বিদেশী পণ্য গ্রহণ করছি। যাই হোক, আমাদের বাস্তবভাবে চিন্তা করতে হবে, দেশীয় শিল্পের উন্নতি বাড়াতে হলে দেশীয় শিল্প পণ্যই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

www.pathagar.com

প্রতি ঘন্টায় লোডশেডিংয়ে অর্থনীতির ক্ষতি পঞ্চাশ কোটি টাকা

আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতির উন্নয়ন এবং মানব সভ্যতার গতিধারায় যে ক্রমবিকাশ চলছে তার পিছনে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ বা জ্বালানি শক্তি ছাড়া আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং মানব সভ্যতা, অর্থনীতির গতিধারা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফল্গুধারা বলতে যা বুঝায় তার সিংহভাগই আজ নির্ভর করছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির উপর।

একটি দেশের অর্থনীতির অবকাঠামোগত বিষয়টিই শুধু বিদ্যুতের সাথে জড়িত নয়, প্রাত্যহিক জীবন ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যুৎ ছাড়া দেশের যেমন অর্থনীতি অচল হয়ে পড়ে তেমনি জনসাধারণের স্বাভাবিক কাজকর্ম স্থগিত হয়ে যায়। বিদ্যুতের অভাব হেতু আমাদের কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা নিয়ে এবার দু'-একটি কথা লিখবো—তা হলে এর গুরুত্ব আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করছে তা উপলব্ধি করা সহজ হবে বলে আমি মনে করি। বিদ্যুৎ না থাকলে আমরা আমাদের পণ্য উৎপাদন করতে পারতাম না। বিদ্যুতের অভাবে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে। অফিস আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। এ দেশের প্রেস মিডিয়াগুলো যথাসময় খবর সংগ্রহ করতে পারত না। প্রেস মিডিয়াগুলো তখন জড় পদার্থের ন্যায় স্থবির হয়ে যেত। বিদ্যুৎ না থাকলে পারিবারিক জীবনে রান্না-বান্না লেখাপড়া থেকে শুরু করে সব কিছুই স্তব্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ না থাকলে বা হঠাৎ বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটলে মন্ত্রী-মিনিস্টারদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রচণ্ড ব্যাঘাত ঘটে। সরকারি বেসরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সভা সমিতিতে উপস্থিত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা যথাসময়ে সম্ভব হয় না। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, হাসপাতালে সার্জিক্যাল চিকিৎসা এবং মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচানো সব কিছুই বিদ্যুতের অভাবে জটিল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ না থাকলে দেশের টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ (টিএন্ডটি) বিভাগ সম্পূর্ণ বিকল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে হিমায়িত মৎস্য ও খাদ্যদ্রব্যের ভীষণ ক্ষতি হয় যা রপ্তানি করে আমরা কোটি কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকি। সুতরাং এক বাক্যে বলা চলে বিদ্যুৎ আর দেশের অর্থনীতি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দেশের সুস্থ অর্থনীতি বিদ্যুৎ ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

কিছুদিন পূর্বে দেশের অর্থনীতিবিদগণ একটি সেমিনারে বলেছিলেন দেশে ঘন ঘন হরতাল এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে দেশের অর্থনীতির প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে। দেশের সার্বিক অর্থনীতির অকল্পনীয় ক্ষতিসাধন এ দু'টি জিনিস করছে। বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং হরতাল যদি চলতেই থাকে তাহলে জাতি তার স্বীয় লক্ষ্যে কখনোই পৌঁছতে পারবে না। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতি যেভাবে বেঁচে থাকার আশা করে তা কখনো সম্ভব হবে

www.pathagar.com

না যদি আমরা এখনই ঐ দু'টি বিষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে না তুলি। বছর কয়েক আগে পত্রিকায় একটি নিউজ দেখেছিলাম। সংবাদটি ছিল এ রকম, জার্মানীর কোন এক শহরে কিছুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ না থাকার কারণে সেখানকার জ্বালানি মন্ত্রীকে চাকরি থেকে ইস্তাফা দিতে হয়েছে। স্বইচ্ছায় তিনি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখজনক যে আমাদের দেশে প্রতিদিন অভিরামভাবে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নগরীর কোন না কোন অঞ্চলে বিদ্যুৎ বন্ধ থাকে। মাঝে মধ্যে গোটা শহরে একই সাথে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় গোটা শহর। চুরি লুটপাটও শালীনতাহানীর মতো দুষ্কর্ম এ সময়ে সংঘটিত হয়। প্রায়ই ঘটে শহরের কোন কোন এলাকায় লোডশেডিং। নগরীর মোহাম্মদপুর বা মিরপুর এলাকায় নয় গোটা নগরীতে চলছে বিদ্যুতের এই অনিয়মের খেলা। প্রতিকারবিহীন এ ব্যবস্থা এখন একটি নিয়মিত অনিয়মে রূপ নিয়েছে। ব্যাপারটি নিয়ে কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ বিভাগের কারো কোন মাথা ব্যথা রয়েছে বলে মনে হয় না। ভাবখানা এ রকম, চলছে তো চলুক আমি ঠিক থাকলেই হলো। অর্থাৎ আমার অবস্থানে কোন অসুবিধা না থাকলেই হলো। আজ দেশের সার্বিক অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

যা হোক, সাধারণ মানুষ আজ তাপদাহে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিষয়টি যখন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তাদের কর্ণগোচর করেন তখন কর্তৃপক্ষের উত্তরকেও খাট করে দেয়ার কোন উপায় নেই। তারা আজ যে কথাটি জোড় গলায় বলছেন তা হলো বিদ্যুতের উৎপাদন এবং এর চাহিদার মধ্যে রয়েছে বিরাট ব্যবধান। অর্থাৎ বিদ্যুতের বর্তমান উৎপাদন এবং তার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে এর নানাবিধ ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে গেছে। এক কথায় যার উত্তর চাহিদার চেয়ে সরবরাহ কম বিধায় নগরীর বিভিন্ন এলাকায় প্রায়ই লোডশেডিং এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাট লেগে রয়েছে। এর সাথে আর একটি বড় কারণ হলো আবাসিক এলাকায় গার্মেন্টস শিল্প স্থাপন এবং আরো ছোট-খাট-মিল কারখানা থাকার কারণে বিদ্যুতের ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে যার কারণে আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। গার্মেন্টস শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহার (Consumed) বেশি হয়। এ ছাড়া রয়েছে এসি এবং ডিসের নতুন সংযোজন। বহু আবাসিক এলাকায় ডিসের অবাধ ব্যবহারের ফলে বিদ্যুতের অপচয় ঘটছে। এর সাথে মহল্লায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ভিডিও গেইমের দোকান। ভিডিও, বিসিআর এবং ডিসের অবাধ ব্যবহারের কারণে বিদ্যুৎ খরচ অতীতের চেয়ে বহুগুণ বেড়ে গেছে। এছাড়া আমরা নিজেরাও বাসা-বাড়িতে বিদ্যুতের প্রচুর অপচয় করছি অযথা লাইট ফ্যান চব্বিশ ঘণ্টা চালু রেখে বা জ্বালিয়ে রেখে। যে কোন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবহারে রাষ্ট্রের ক্ষতি হয় না। ক্ষতি হয় এর অপচয় এবং অপব্যবহার ঘটলে। বিদ্যুতের অনিয়ম নিয়ে অভিজ্ঞজনরা আরো কিছু সুনির্দিষ্ট

www.pathagar.com

কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন ঘন ঘন রাস্তা মেরামত ও স্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ লাইনের কাজ সম্পূর্ণ করা হয় না। বৈদ্যুতিক কেবল ও সরঞ্জামাদি উন্নতমানের নয় বিধায় একটু ঝড় বৃষ্টিতেই বিদ্যুৎ চলে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের মতো বড় বড় দুর্ঘটনাও এ কারণে ঘটছে। এ জন্য বৈদ্যুতিক লাইনে উন্নতমানের নির্মাণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাশাপাশি সকল অবৈধ বৈদ্যুতিক সংযোগ রোধ করতে হবে। তাহলেই দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে।

ফারাক্কার মরুকরণের ফলে গোটা দেশে বিরাজ করছে প্রচণ্ড তাপদাহ। পাশাপাশি দেশের জনসংখ্যাও হু-হু করে বেড়ে চলেছে ফলে বিদ্যুতের বহুবিধ ব্যবহার অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় এখন অনেক বেশি বলা চলে। ফলে বিদ্যুতের বর্তমান উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্যতাও বাড়ছে। উল্লেখিত সমস্যাদির আলোকে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন খাত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার কথা বলেছেন। দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট ক্ষমতা ২৮৭৮ মেঘাওয়াট হলেও পুরনো যন্ত্রপাতির কারণে প্রকৃত উৎপাদন ১৯০০ মেঘাওয়াটের বেশি হচ্ছে না। ২০০০ সালের মধ্যে চাহিদার নিরিখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন প্রায় ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের। গত ১৫ জুন '৯৫ জাতীয় সংসদে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আরো বলেছেন যে সরকারের একার পক্ষে এই বিনিয়োগ সম্ভব নয়। তাই সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ হতে ৩৭টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে যার প্রায় ৮টির সাথে ইতিমধ্যে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত জ্বালানি মন্ত্রী ডঃ মোশাররফ হোসেন বলেছেন. বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এই মুহূর্তে ১০,০০০ কোটি টাকা বিদ্যুৎখাতে ব্যয় করার প্রয়োজন রয়েছে। তাই সরকার বাধ্য হয়ে বিদ্যুৎ খাতকে বেসরকারিকরণের অনুমতি প্রদান করেছেন। এ হলো বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণে সরকারি নানাবিধ ভাষ্য।

দেহের সাথে যেমন নাড়ির সম্পর্ক ঠিক তদ্রূপ বিদ্যুতের সাথে অর্থনীতির রয়েছে সেই সম্পর্ক। এক কথায় নাড়ির স্পন্দন না থাকলে দেহের যেমন কোন মূল্য থাকে না তেমনি বিদ্যুৎ না থাকলে দেশের অর্থনীতিও অচল হয়ে পড়ে।

দেশে ২৪ ঘণ্টায় গড়ে প্রতিদিন যদি ১ ঘণ্টা বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয় ছোট্ট একটি অংক কষলেই সেই হিসাব আমরা পেয়ে যাব। দেশের বিদ্যুৎ অর্থনীতিবিদদের হিসাব মতে ঐ এক ঘণ্টায় কল কারখানা অফিস আদালত ও ব্যবসা বাণিজ্যে উৎপাদনসহ কাজকর্মের যে ক্ষতি সাধন হয় তার মূল্য দৈনিক নিম্নতম ৫০ কোটি

www.pathagar.com

টাকা। এ হলো প্রতিদিনের নিম্নতম হিসাব। ৩০ দিন যদি এভাবে চলে তাহলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০×৩০ = ১,৫০০ কোটি টাকা। এ হলো একমাসের হিসাব। তাহলে বছরে আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি হচ্ছে ১,৫০০×১২ = ১৮,০০০ কোটি টাকা। ভাবতেও অবাক লাগে শুধু বিদ্যুতের অনিয়মের কারণে প্রতি বছর যদি আমাদের জাতীয় আয় ১৮,০০০ কোটি টাকা বিনষ্ট হয় তাহলে উন্নতশীল বিশ্বের সাথে আমরা কিভাবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবো। এরপর রয়েছে ধর্মঘট, অবরোধ ও হরতাল। এতে প্রতিদিন ক্ষতি হয় ৪০০ কোটি টাকা। বিগত ৪ বছরে (৯১-৯৬)বিরোধী দল সর্বমোট ১৭৩ দিন হরতাল ও অবরোধ আহবান করেছেন। তাহলে ঐ ১৭৩ দিনে অর্থনীতির ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে (১৭৩×৪০০)=৬৯,২০০ কোটি টাকা। আমরা জেনে শুনে কিভাবে আমরা আমাদের অস্তিত্বের মূল কেন্দ্রে আঘাত করছি। কিভাবে আমরা প্রতিনিয়ত সুজলা সুফলা স্বনির্ভর এই দেশটাকে ভিক্ষুকের দেশে রূপান্তরিত করছি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিষয়টি গভীরভাবে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। হরতাল এবং বিদ্যুতের অনিয়ম যে আমাদের অর্থনীতিকে অচল করে দিচ্ছে এ কথা মনে হয় এখন আর কাউকে বলে বুঝিয়ে দিতে হবে না। সচেতন আত্মমর্যাদাশীল গর্বিত একটি জাতি এ ধরনের ক্ষতি মেনে নিতে পারে না।

সরকারি হিসাব মতে বিদ্যুৎ খাতে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা সিস্টেম লস হয়। কিন্তু কেন এই সিস্টেম লস? কিভাবে এই ক্ষতি কাটিয়ে উঠা যায় তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই। বিদ্যুতের অপচয়, সময়মতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করা এবং বিদ্যুতের অবৈধ সংযোগ থেকে সিস্টেম লসের সূত্রপাত ঘটে। National feeling ও গণসচেতনতা না আসলে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় থেকে অব্যাহতি লাভ সম্ভব নয়। প্রতিদিন এই তিনটি খাতে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করছি। অবৈধ সংযোগের ব্যাপারে স্বয়ং বিদ্যুৎ বিভাগই সোচ্চার নয় বলে জানা যায়। কারণ এর পিছনে টাকা-পয়সা আয় করার ব্যাপার রয়েছে। এ সমস্ত কারণে বিদ্যুৎ খাতে যে পরিমাণ আয় আসার কথা ছিল তা আসছে না। প্রত্যেকটি বিষয়ভিত্তিক ব্যাপারে একটি সুনির্দিষ্ট প্লানিং থাকা উচিত। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে সরকার, ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা অবশ্যই থাকতে হবে। বিদ্যুৎ বিভাগের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে বিদ্যুৎ সেল গঠন করে কঠোর শাস্তির বিধান জারি করতে হবে। বিদ্যুৎ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বিভাগ সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে তুলে দিলে সিস্টেম লস ও নগরীর বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অবসান ঘটবে। জাতি প্রতিদিনকার অসহনীয় দুঃখ দুর্দশার হাত থেকেও পরিত্রাণ পাবে।

বিশ্ব ব্যাংকের সদরদপ্তরে কর্মরত দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন বাংলাদেশ নীতিগতভাবে জ্বালানি খাতের সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করলেও এর বাস্তবায়নের অবস্থা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। বিদ্যুৎ সংকটের জন্য বাংলাদেশে প্রতি বছর একশ কোটি মার্কিন ডলারের (৫৪০০কোটি টাকা) উৎপাদন ক্ষতি হচ্ছে।

www.pathagar.com

নিম্নে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের (মেগাওয়াট) ১০ দিনের একটা হিসাব দেয়া হলো ঃ

দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিস্থিতি

তারিখ	চাহিদা (মেঃ ওঃ)	উৎপাদন(মেঃ ওঃ)
০১-০৭-২০০০	২৬৭০.০	২৬৪৪.০
০২-০৭-২০০০	২৭২৫.০	২৬০১.৪
০৩-০৭-২০০০	২৭২৭.০	২৬৪৯.৬
০৪-০৭-২০০০	২৭৭৯.০	২৭৬০.৪
০৫-০৭-২০০০	২৭৭৫.০	২৫৪৫.৩
০৬-০৭-২০০০	২৭৬০.০	২৫৫৪.২
০৭-০৭-২০০০	২৬৫০.০	২৫২৫.৩
০৮-০৭-২০০০	২৬৮৫.০	২৫৫৯.৭
০৯-০৭-২০০০	২৭০০.৬	২৫৫৭.৭
১০-০৭-২০০০	২৭২৭.০	২৫৯০.৭

উল্লেখিত চিত্রে দেখা যায় চাহিদা অনুপাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল অনেক কম।

জাতীয় অর্থনীতিতে বীমা শিল্পের গুরুত্ব

বর্তমান যুগ যান্ত্রিক যুগ। যন্ত্র যেমন বেড়েছে, তেমনি এর পাশাপাশি উদ্বেগ-জনকভাবে বেড়েছে— সম্পদ আর জীবনহানির ঝুঁকি। আধুনিক বিজ্ঞান যত নিত্যনতুন ফর্মূলা আবিষ্কার করেছে মানুষের আরাম-আয়েশের জন্য, পাশাপাশি আবার মানুষের মূল্যবান জীবন এবং তার সম্পদ প্রতিদিন যান্ত্রিক দানবগুলো কেড়ে নিচ্ছে। এ জন্য কিন্তু বিজ্ঞানকে দোষারূপ করা যাবে না। উত্থান-পতন, আয়-ব্যয়, ভাঙ্গা আর গড়া—এ নিয়েই আধুনিক বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেছে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারকে কল্যাণের পথে ধাবিত করার দায়িত্ব মানুষের। মানুষ চাইলে বিজ্ঞানকে মানব কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারে। এ জন্য সৎ এবং সুস্থ মন-মস্তিস্কসম্পন্ন একটি মানব সমাজ গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের মানব সমাজের প্রচণ্ড অভাব বিধায় গোটা বিশ্বে অস্থিরতার পাশাপাশি জীবন এবং সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। প্রসঙ্গের আলোকে তাই বলতে হয়—সমাজ এবং তার অর্থনীতির রক্ষণা বেক্ষণ (Protection) এর জন্য বীমা শিল্পের গুরুত্ব আজ অনেক।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জাতীয় অর্থনীতির সুস্থ বিকাশ সাধনে বীমা শিল্প যথেষ্ট অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক Network হিসাবেও অর্থনীতির মজবুত ভিত গড়ে

www.pathagar.com

তোলার লক্ষ্যে বীমা শিল্প বিশ্বময় কাজ করে যাচ্ছে। বীমা শিল্পের ব্যাপক প্রসারের কারণে মানুষের জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি অনেক কমেছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। সমস্যায় জর্জরিত এদেশের অর্থনীতি। অসুস্থ রাজনীতি, দেশাত্মবোধের প্রচণ্ড অভাব, বিজাতীয় চিন্তাধারা জাতীয় অর্থনীতি বিকাশ সাধনে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক এই দুর্বল অর্থনীতিকে সবল করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে সাহসী ভূমিকা নিয়ে বীমা শিল্পগুলো এগিয়ে এসেছে। এটা জাতীয় অর্থনীতির জন্য একটি ইতিবাচক দিক। একদিকে জনবহুল দেশ, অন্যদিকে বিভিন্ন অনিয়ম বিদ্যমান থাকার কারণে আমাদের দেশে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় দুর্ঘটনা বেশি ঘটছে। এ জন্য বীমা শিল্পের ভূমিকাও আমাদের দেশে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে । বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাধিক বীমা শিল্প গড়ে উঠেছে। আমেরিকান লাইফ ইনস্যুরেন্স নামে একটি বহুজাতিক বীমা শিল্প এদেশে কাজ করে যাচ্ছে ১৯৫৫ সাল থেকে। শোনা যায়, জীবন বীমা নামে খ্যাত এই মার্কিন বীমা শিল্পটি সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বেশি "প্রিমিয়াম" আয় করেছেন। দেশীয় কোম্পানির তুলনায় এই কোম্পানীর পলিসি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার আনুষঙ্গিক কিছু কারণ রয়েছে। প্রথমত, যে কারণে পলিসি করা হলো, সেই কারণটি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই উক্ত কোম্পানিটি সর্বাধিক সকল সুযোগ-সুবিধাসহ পলিসির পুরো টাকা পলিসি হোল্ডারকে ফেরত দেন। শিল্প বীমা, দুর্ঘটনাজনিত বীমাসহ হঠাৎ মৃত্যু ইত্যাদি সকল ব্যাপারেই তাদের তৎপর ভূমিকা বীমা ব্যবসাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমি নিজেও উক্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনার অধীনে প্রায় এক মাস ট্রেনিং নিয়ে ছিলাম। সময়টি ছিল ১৯৮৪ সাল। বীমা শিল্পের কিছু খুঁটিনাটি বিষয় আমি ঐ সময় জানতে পারি। উক্ত কোম্পানির Field force-এ যারা রয়েছে, বীমা করানোর ক্ষেত্রে তাদের আকর্ষণীয় ক্ষমতা রয়েছে। যেমনি পরিশ্রমী তেমনি প্রাণবন্ত ও চটপটে স্বভাবের অধিকারী তারা। বীমা করানোর ব্যাপারে এবং এর পাশাপাশি Premium collection-এর পদ্ধতিগত দিকসমূহ বিভিন্ন রকম ট্রেনিং ও সেমিনারের মাধ্যমে তারা শিখিয়ে দেন। তাদের এই প্রশিক্ষণের কলা-কৌশলগুলো অত্যন্ত বাস্তব ভিত্তিক–যা গ্রাহক বৃদ্ধির সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশীয় বীমা কোম্পনীগুলোতে এ ধরনের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকার কারণে তারা এখনো তুলনামূলকভাবে বিদেশী বীমা কোম্পানির চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। মূলত আমাদের দেশে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবহেতু আমরা শিল্প ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছি। যাই হোক দেশীয় বীমা শিল্পের মধ্যে ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানিমূলত পারফরমেন্সের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে সাধারণত দু'ধরনের বীমা শিল্পের অস্তিত্ব রয়েছে। একটি হলো—সাধারণ বীমা এবং অন্যটি হলো জীবন বীমা। বীমার ক্ষেত্রে এই দু'ধরনের বীমা শিল্প সরকারি নিয়ন্ত্রণবিহীন থাকলেও বর্তমানে প্রায় ৩০টি Private Insurance Company বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে। কোম্পানিগুলোর ব্যবসাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মোট কথা হলো—কোন অসৎ উদ্দেশ্য যদি বীমা শিল্পের মালিকদের না থাকে তাহলে এই শিল্প কখনোই অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয় না। জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে আনুষ্ঠানিক খরচাদি বছরান্তে হয়। এ ছাড়া তাদের অন্য কোন খরচ খুব একটা হয় না। সুতরাং ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি থাকে বলে এই প্রতিষ্ঠানটি দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

সাধারণত জীবন বীমা কোম্পানিগুলো একজন ব্যক্তির জীবন সম্বন্ধীয় সকল প্রকার বীমার কার্যবিধি পরিচালনা করে থাকে। জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা শিল্পসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সকল ধরনের বীমার কাজ সমাধা করে থাকে। যেমন জল, স্থল ও আকাশপথে আমদানি রফতানি কাজে ব্যবহৃত পণ্যসামগ্রী, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নষ্ট হয়ে যাওয়া যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাড়ি-ঘর, অর্থাৎ সর্ব অবস্থায় বিপদকালীন সময়ে বীমা কোম্পানিগুলো আমাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। পূর্বেই আমি বলেছি, অন্যান্য দেশের তুলনায় জাতিগতভাবে আমরা যেমন একটু আবেগপ্রবণ বেশি তেমনি ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তা-ভাবনাও প্রচুর যার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা বেশি। পাশাপাশি রয়েছে পরিবেশগত দুর্যোগ। সুতরাং সম্পদ এবং জীবনের ঝুঁকি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে বীমা শিল্প এদেশে সম্প্রসারিত হওয়ার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বীমা শিল্পগুলো তাদের প্রচুর শেয়ার মার্কেটে ছেড়েছেন। এখনো ছাড়ছেন। বাজারে বীমা শিল্পের শেয়ারে চাহিদাও প্রচুর রয়েছে। শেয়ারের Market value অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় কম নয়। বছরান্তে Dividend ও ভাল।

বীমা শিল্পের পলিসিগুলোর মেয়াদকাল দীর্ঘকালীন বিধায় ব্যবসা ঘুটিয়ে ফেলার সুযোগ কম। পলিসি হোল্ডারদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ থাকে বলে চুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প কোন চিন্তা-ভাবনা তারা করতে পারে না। প্রতিটি বীমা কোম্পানিতে এ ধরনের অগণিত বিভিন্ন মেয়াদের পলিসি হোল্ডার রয়েছে। সর্বশেষ পলিসি হোল্ডারদের মেয়াদপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অথবা উক্ত পলিসি হোল্ডারটি তার পলিসি সারেন্ডার না করা পর্যন্ত বীমা শিল্পের ব্যবস্থাপনার কর্মকর্তাবৃন্দ এমনকি মালিক পর্যন্ত পলিসি হোল্ডারদের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। সুতরাং বীমা শিল্পে যারা কর্মরত রয়েছে তাদের চাকরি হারানোর ভয় খুব কম থাকে। মালিক পক্ষের কোন অসৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ পলিসি হোল্ডারদের টাকা আত্মসাত করে দেয়ার কোন দুরভিসন্ধি যদি না থাকে তাহলে এ ব্যবসা দেশ ও জাতির

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড গড়ে তোলার একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বীমা শিল্পের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো বীমা শিল্পে নিয়োজিত Field force-দের করতে হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে অসহ্যজনক কাজটি হলো, প্রতিনিয়ত অন্যের দ্বারস্থ হওয়া এবং বার বার প্রিমিয়ামের জন্য Reminder দেয়া। এই অসহ্যজনক কাজটি যারা সহ্য করে যেতে পারেন তারাই তর তর করে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যান। অন্যের দ্বারস্থ হওয়া—"আত্ম মর্যাদারহানি" অনেকেই কথাটি এই শিল্পের ক্ষেত্রে এসে ভাবেন। তাছাড়া তাৎক্ষণিক কোন বিনিময় এই শিল্পে নেই বিধায় ব্যবসার কিছু ঝুঁকি রয়েছে। বছরান্তে পলিসি এবং প্রিমিয়ামের যে টার্গেট দেয়া থাকে তা অনেক সময়ে পূরণ হয় না। ইত্যাদি কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য সহকারে এ ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারলে মুনাফার অংক বাড়বে বৈ কমবে না। বিপদকালীন ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলছে। সুতরাং এ ব্যবসায় গ্রাহক সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়বে। সেই হিসাবে এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। তাই এই মুহূর্তে শিল্প বাজার অর্থনীতির বিকাশ সাধনে বীমা শিল্পের গুরুত্ব ও জোড়ালো ভূমিকার কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেনা।

---

www.pathagar.com

বিপর্যস্ত অর্থনীতি ঃ
জাতির জন্য মহা বিপদসংকেত

অতীত এখন একটি মূল্যবান শব্দ। এই অতীত নিয়ে সংসদ এখন উত্তপ্ত। রাজনৈতিক মঞ্চ, সেমিনার ও সভা মঞ্চ সর্বস্থানে এই অতীত নিয়ে একটি যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব বিরাজ করছে। অতীতের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারলেই যেন বেঁচে যাই, এ ধরনের একটি মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে আমাদের কারো কারো মধ্যে। কিন্তু এ ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক ডেল কর্নেগী বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেছেন, অতীত মৃত—বর্তমানই জীবন্ত। অতীতের দরজায় তালা লাগাও—বর্তমানকে নিয়ে ব্যস্ত থাক। কিন্তু বর্তমান দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার পর একটি কথাই বার বার বলেছেন-২১ বছর দেশে কোন উন্নয়ন হয়নি। বিএনপি দেশটাকে শেষ করে দিয়ে গেছে। অতীতের দুই মরহুম ব্যক্তি নিয়েই চলছে আমাদের নিত্যদিনের রাজনীতি। এজন্যে অনেক সময় ভাবতে হয়—এ দু'জন ব্যক্তি নিয়েই কি আমাদের জীবন। এছাড়া কি আমাদের কোন কাজ-কর্ম নেই। এই দুই ব্যক্তিকে নিয়ে অহেতুক আলোচনায় সংসদ প্রতিদিন উত্তপ্ত হচ্ছে। সংসদে কার্যবিধি দেখে বামপন্থী একজন রাজনীতিবিদ বলেছেন—সংসদ এখন সভ্য মানুষের পর্যায়ে নেই একে এখন গরুর খোয়ার বলাই উত্তম। দেশে এখন চরম অর্থনীতির ক্রান্তিকাল চলছে। যে কোন সময় দেশের অর্থনৈতিক সেক্টরসমূহে ব্যাপক ধস নামতে পারে। ইতিমধ্যেই শেয়ারবাজারের বিপর্যয় নিয়ে দেশের অর্থমন্ত্রী বলেছেন আমি শেয়ার বাজার বুঝি না। দেশের ব্যাংক গভর্নর বলেছেন, যে কোন সময় ব্যাংকে লাল বাতি জ্বলতে পারে। দেশের প্রচলিত আইনে মেয়াদপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কর্মচারী ছাঁটাই নিষিদ্ধ, অথচ এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর সরকারি ও প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে। এই যদি হয় দেশের প্রকৃত অবস্থা তাহলে সেই দেশে বিদেশীরা বিনিয়োগ করবে কোন দুঃখে।

অর্থমন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে ৩ হাজার ৯৬৬ কোটি ৪৫ লাখ টাকা পাওনা রয়েছে। এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ ঋণ ১ হাজার ৬২৫ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। সর্ব মোট পাওনার মধ্যে খেলাপি ঋণের হার ৪৭·৩০ শতাংশ। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কয়েক হাজার কোটি টাকার মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ বছরের পর বছর পড়ে আছে। এদিকে সরকার শেয়ার কেলেংকারি দুর্বৃত্তদের ছেড়ে

www.pathagar.com

দিয়েছেন। যারা শেয়ার মেনিপুলেট করে জনগণের টাকা লুট করলো তাদের নামকাওয়াস্তে গ্রেফতার করে পড়ে ছেড়ে দিয়েছেন। বলতে গেলে এটা ছিল একটি আই ওয়াস। সরকার জনগণকে দেখানোর জন্যই কাজটি করেছেন। ভারত ও সিঙ্গাপুরে শেয়ার কেলেংকারির দায়ে অশোক মেহেতাসহ অনেকেরই কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের দেশে ঋণখেলাপি আর শেয়ার দুর্বৃত্তদের সরকার দুধ কলা দিয়ে পুষছেন। এখন অনেকেই তাই প্রশ্ন তুলেছেন মুজিব আমলের সেই স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট কি শুধু বিরোধী দলের লোকদের ধরার জন্যেই সক্রিয়, অন্য কারো বেলায় তা কার্যকরী নয়। এ সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ ১২ মাস পূর্ণ না হতেই দেশের অর্থনীতির ১২টা বেজে গেছে। ইতিমধ্যেই ডলারের দাম-৪৩·৮৩ টাকা অতিক্রম করেছে। এটা '৯৭ এর হিসাবানুযায়ী। সরকারি কর্মচারীরা বেতন বৃদ্ধির দাবি তুলেছেন। বাজারে দ্রব্যমূল্য দ্রুত বেগে বাড়ছে। এই ১০ মাসে রফতানির চেয়ে আমদানির পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। এ ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে সরকার মুদ্রার অবমূল্যায়ন কিভাবে চেক দেবে এবং প্রবৃদ্ধির হার যে বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে তাই বা কি করে সম্ভব। গোঁজামিল দিয়ে অর্থনীতির অংক মিলালেও অর্থনীতিবিশারদরা তা ধরে ফেলবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বিএনপি বিগত পাঁচ বছরে দেশের জন্যে কিছুই করেনি। অপরের ঘাড়ে দোষ চাপানোর এই প্রবণতা তার মরহুম পিতারও ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন খানসেনারা দেশ শেষ করে দিয়ে গেছে, আমি তিন বছর কিছু দিবার পারুম না। এভাবেই জনগণকে বুঝিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিন বছর পর জনগণকে তিনি যা দিলেন তা হলো একটি ব্যাপকভিত্তিক দুর্ভিক্ষ, এক দলীয় শাসন 'বাকশাল' ও একটি কালা-কানুন যার নাম, Special Power Act '74। ধন্য পিতার ধন্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও কি সেই পথ অবলম্বন করছেন? বইপুস্তকে পড়েছি অক্ষম এবং অকর্মণ্য ব্যক্তিরাই নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে আত্মসন্তুটি লাভ করতে চাইতেন।

প্রধানমন্ত্রীর অসত্য কথন বা সত্য বাচন—সে ব্যাপারে আমরা কিছু বলতে চাই না কিন্তু তার মন্ত্রিরাই সপ্তম সংসদের চতুর্থ অধিবেশনে সে কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। শেখ হাসিনার সচরাচর উক্তি বিএনপির আমলে কিছুই হয়নি। সংসদে দাঁড়িয়ে এই যুক্তি খণ্ডিয়েছেন তারই এক মন্ত্রী এই কথা বলে যে বিএনপির '৯১ সন থেকে '৯৬ সন পর্যন্ত দেশে ৮২ হাজার ২৫৪টি নতুন শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে। তার মধ্যে ৭১ হাজার ৮৫০টি কুটির শিল্প। কথাটি বলেছেন শেখ হাসিনার শিল্প উজির তোফায়েল আহমদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরেকটি কথা সব সময়ে বলতেন—বিএনপি বিদ্যুতের ১২টা বাজিয়ে দিয়ে গেছে যার কারণে এই লোডশেডিং। কিন্তু তার বিদ্যুৎ উজির জেনারেল (অবঃ) নুরুদ্দিন খান সপ্তম সংসদে ৪র্থ অধিবেশনে বলেছেন ঠিক প্রধানমন্ত্রীর উল্টো

www.pathagar.com

কথাটা তিনি বলেছেন যে, ১৯৯১-এর জুলাই থেকে ১৯৯৫ সালের জুলাই পর্যন্ত বাঘাবাড়ি চট্টগ্রাম, ঘোড়াশাল ও সিলেটে ৪টি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যার উৎপাদন ক্ষমতা ৫৮১ মেগাওয়াট। এটা কি প্রধানমন্ত্রীর অসত্য বাচনের গালে আরেকটি চপেটাঘাত নয়। সপ্তম সংসদে ৪র্থ অধিবেশনে ট্রানজিট নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে সেখানেও সত্যকে গোপন করে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে। ভুল করছি আমি আর দোষ চাপাচ্ছি অন্যের ঘাড়ে। এজন্যে সাস্টা-এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রানজিট চুক্তিকে একই চুক্তি বলে ঢালাওভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন হলো বিএনপি সরকার যদি ট্রানজিট চুক্তি করেই থাকে তাহলে আবার নতুন চুক্তির প্রয়োজন হলো কেন। '৮০ সালে যদি বিএনপি চুক্তি করেই থাকে তাহলে এই ১৭ বছর ভারতীয়-পণ্যবাহী গাড়ি বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলাচল করতে দেখা যায়নি কেন? এটা কি ধরনের Eye wash। দর্শনশাস্ত্রে একটি কথা উল্লেখ রয়েছে–যুক্তিই বড়। যুক্তিতর্কে যারা পেরে উঠেন না তারাই পেশী আর চাপার জোরে টিকে থাকতে চান।

অতীত নিয়ে আমরা অনেক কথাই বলেছি এবার আমরা বিএনপির রেখে যাওয়া বিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে কতটুকু উত্তরণ বিগত এক বছরে ঘটাতে পেরেছি তার একটি হিসাব এখানে তুলে ধরছি। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ পদত্যাগ করার সময় (১৯৯০ ইং-৬ডিসেম্বর) ৭০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা রেখে গিয়েছিলেন। বেগম জিয়ার সরকার ৭০ কোটি ডলার দিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং বেগম জিয়ার সরকার ১৯৯৬ সালে ৩০ মার্চ যখন পদত্যাগ করেন তখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২০ কোটি ডলার। অর্থাৎ ১৩ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা। ৭০ কোটি ডলার থেকে ৩২০ কোটি ডলার অর্থাৎ বেগম জিয়ার পাঁচ বছরে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছিল ২৫০ কোটি ডলার। বাংলাদেশের মুদ্রায় যার হিসাব দাঁড়ায় ১০ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা (প্রতি ডলার ৪৩ টাকা)। এর পর প্রায় এক বছর পার হয়ে গেছে। অর্থাৎ ৩১ মার্চ ১৯৯৭ সাল-বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া হিসাব অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১৭৩ কোটি ডলার। অর্থাৎ, মাত্র এক বছরে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল হ্রাস পেয়েছে ১৪৭ কোটি ডলার বা ৬ হাজার ৩২১ কোটি টাকা (১ ডলার = ৪৩ টাকা)। মাত্র এক বছরে বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল নিঃশেষ হয়ে অর্ধেকে নেমে আসায় অর্থনীতিতে নিঃসন্দেহে একটি অশনী সংকেত। আওয়ামী লীগের বিগত এক বছরের শাসনামলে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল না, রাজনৈতিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়নি। খাদ্য উৎপাদনও অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে ভাল ছিল, অন্যদিকে বিএনপির শাসনামলের প্রথম দুই বছর ছাড়া বাকি তিন বছর রাজনৈতিক চরম অস্থিরতার মধ্যে কাটাতে হয়েছিল। '৯৫-৯৬ ছিল চরম খাদ্য সংকট।

www.pathagar.com

এ সময় খাদ্য উৎপাদন হয়েছিল ১ কোটি ৯০ লাখ টন। এর পরেও খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে ২৫ লাখ টন। এ সমস্ত কারণে সে সময় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার ড্রেনেজ হয়েছে। এর পরেও ৩২০ কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

১৯৯৭ সালে খাদ্য উৎপাদন হয়েছে ২ কোটি ১৪ লাখ টন। অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ২৪ লাখ টন বেশি। ফলে খাদ্য শস্য আমদানির প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ড্রেনেজ হয়নি। এ সময় প্রবাসী বাঙালিদের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণও গত বছরের তুলনায় বেশি ছিল। এতসব অনুকূল অবস্থা বিদ্যামান থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে পাহাড় পরিমাণ ধস নামালো কেন সে কথাই ভাববার বিষয়। ১৯৯১ সালে শুরুতে পোশাক রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয়েছিল ৭১ কোটি ডলার। ১৯৯৫ সনে তা বেড়ে হয় ২৪৯ কোটি ডলার।

বিএনপির প্রথম চার বছরে পোশাক শিল্পের সংখ্যা বেড়েছে–২২৬৮টি–এর আগে ছিল ৭৮০টি। শ্রমিক সংখ্যা ছিল যেখানে ৩ লাখ তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২ লাখ। যে খাত থেকে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা সবচেয়ে বেশি অর্জন করেছিলাম সে খাতেই বিগত এক বছরে সব চেয়ে বেশি ধস নেমেছে। বিগত ১০ মাসে আমেরিকায় পোশাক রফতানির পরিমাণ কমেছে ৭ শতাংশ। অর্থাৎ এখানে রফতানি কমেছে ৪৯ শতাংশ। শেয়ার বাজারের পর চামড়া বাজারে একই প্রক্রিয়ায় ধস নামানো হয়েছে। হিন্দুস্তানী মারোয়াড়ীরা হাজার কোটি টাকারও উপর অর্থ লুট করে নেয়ার পর মূল্যসূচক ৯ শতেরও নিচে নেমে আসে যা মুম্বাই ও মেক্সিকোর ক্রাস ডাউনকে হার মানিয়েছে। আজ চামড়া শিল্পকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বিগত সরকারের আমলে চামড়া শিল্প আন্তর্জাতিক বাজার পেয়েছিল। তখন এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বছরে ৩/৪ শ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছিল। আর বর্তমান সরকার এ বছর এ খাতে মাত্র ২৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। ফলে কম দামে চামড়া ব্যবসায়ীরা ভারতের কাছে চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

এ সরকারের আমলে চা-শিল্পেও ধস নামে। চায়ের বিশ্ব বাজার এখন কেনিয়া ও শ্রীলংকার হাতে চলে গেছে। গার্মেন্টেসের বিশ্ব বাজার পুনরায় ভারত, শ্রীলংকা এবং মালয়েশিয়া দখল করে ফেলেছে। পাট, চা, চামড়া ও পোশাক শিল্প রফতানির এই চারটি সনাতনী পণ্যই আজ রফতানি মার্কেট থেকে আউট হওয়ার পথে। মুদ্রা মানের ধস কিভাবে নেমেছে তার একটি সহজ পরিসংখ্যান তুলে ধরছি—৯৫-৯৬ সালে ডলারের সাথে বাংলাদেশের মুদ্রার বিনিময়ের হার ছিল ৪১·১০ টাকা। কিন্তু বর্তমানে এই বিনিময় হার এক ডলার সমান ৪৩·৮৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মাত্র এক বছরের মাথায় বাংলাদেশী টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে ২·৭৫ টাকা। গত বছরের চেয়ে এখন বিদেশ

www.pathagar.com

থেকে পণ্য আমদানি করতে হলে দেশী মুদ্রায় ১১৬ টাকা বেশি দিতে হবে। অবমূল্যানের যুক্তি হিসেবে সরকার বার বার বলছেন—এর ফলে রফতানির পরিমাণ বাড়াবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উন্নতি ঘটবে কিন্তু বিগত ১০ মাসের চালচিত্র প্রত্যাশার বিপরীত।

জনগণ প্রত্যাশা করেছিল বিএনপি আমলের এশিয়ার ইমার্জিং টাইগারকে (এ টাইটেল উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে বিগত সরকার অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল) পরিপূর্ণ টাইগারে পরিণত করবে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার। কিন্তু সে আশা নিরাশায় রূপ নিয়েছে। ৯-৫-৯৭ ভোরের কাগজ পত্রিকায় আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী তার নিয়মিত কলামে লিখেছেন—আঃ লীগ যতই ভুল ভ্রান্তি করুক, দলটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শত্রু নয়। এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতো অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধ করতে না পারলে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়িত হবে। মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্যই ছিল অর্থনৈতিক মুক্তি এই সত্য কথাটি গাফ্ফার চৌধুরী সাহেবরা যে স্বীকার করতে চান না সেটাই ভাববার বিষয়।

---

www.pathagar.com

চামড়া শিল্প
সামনে ঘোরতর দুর্দিন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উৎসসমূহকে ধ্বংস করে দিয়ে দেশকে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার এক সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র চালানো হয়। প্রথমে এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তারা পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে বাংলাদেশের সোনালী আঁশ পাট শিল্পকে ধ্বংস করেন। তারপর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে একাধিকবার আগুন লাগিয়ে এবং পরবর্তী সময়ে হরতাল ও ধর্মঘটের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় এই শিল্পের দুর্বার গতিকে স্তব্ধ করে দেন। এরপর উদীয়মান ওষুধ শিল্পকে সংকটের মধ্যে ফেলে বহু জাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলোকে বিতারিত করা হয় যাতে দেশে উন্নতমানের রিসার্স প্রডাক্ট তৈরির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি না হয়। এসব ওষুধের বাজার এখন ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ওষুধের মিডফোর্ড বাজারে এখন ভারতীয় ওষুধের ছড়াছড়ি। মোট কথা শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসা, এখন ভারতের দখলে। গ্যাস এবং বিদ্যুৎকেও পরিকল্পিত উপায়ে সমস্যার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়। অর্থাৎ দেশের জ্বালানি শিল্পকেও পরনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গ নিয়ে যে কথাটি বলতে হয় তাহলো দেশের বর্তমান সম্ভাবনাময় চামড়া শিল্পকেও ধ্বংস করার জন্য মহল বিশেষ আজ উঠে পড়ে লেগেছে। অর্থাৎ দেশকে পুনরায় তলাহীন ঝুড়িতে পরিণত করার এক ব্যাপক পরিকল্পনা চলছে।

শেয়ার বাজারে ধস নামিয়ে সাধারণ মানুষের টাকা যেভাবে লোপাট করা হয়েছে ঠিক সেই একই পদ্ধতিতে প্রতিবছর কোরবাণির ঈদের পর থেকে চামড়া শিল্পকে সংকটের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকার এখনও কোন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বলে শোনা যায়। পত্রিকায় প্রকাশ সরকার যদি সহসা কোন ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ না করে তাহলে ২/১মাসের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগ ট্যানারী শিল্প বন্ধ করে দিতে হবে বলে ব্যবসায়ীরা আশংকা প্রকাশ করেন। কয়েক বছর পূর্বেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্পের অবস্থান ছিল দ্বিতীয়। বর্তমানে এর অবস্থান দাঁড়িয়েছে পঞ্চম। এ শিল্প খাত থেকে রফতানি আয় হতো শতকরা ১৩ ভাগ। আমাদের দেশে সর্বমোট ২৮০ টি চামড়া জাত কারখানা রয়েছে। সবগুলোর অবস্থাই এখন শোচনীয় বলা যায়। রফতানি আয়ও অতীতের চেয়ে অনেক হ্রাস পেয়েছে।

www.pathagar.com

এ সংকট কিভাবে হঠাৎ সৃষ্টি হলো এবং নেপথ্য ভূমিকায়ইবা কারা জড়িত রয়েছে সে ব্যাপারে দু'-একটি কথা লিখতে হয়। মূলত কোরবাণি ঈদের দিন বিকাল থেকেই আকস্মিকভাবে চামড়ার দরপতন শুরু হয়। গত বছর (১৯৯৬ ইং) এই দিনে ১৫/১৬ হাজার টাকার একটি গরুর চামড়া যেখানে ১৫০০ থেকে ২০০০ টাকা বিক্রি হয়েছিল এবার (১৯৯৭ ইং) সেই একই গরুর চামড়া মাত্র ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা বিক্রি হতে দেখা গেছে। চামড়া ব্যবসায়ীদের থেকে অভিযোগ উঠেছে যে প্রচলিত নিয়মে এবার তারা ব্যাংক থেকে ঋণ পাননি। কোরবাণির ঈদের পূর্বে থেকেই সরকার চামড়ার বাজারের স্বাভাবিক গতিধারা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশের বিভিন্ন এতিমখানা এবং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যারা নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে চামড়া সংগ্রহ করে থাকে তারাও আশানুরূপ মূল্যে চামড়া বিক্রি করতে পারেনি । বহুস্থানে ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সংগ্রহকৃত চামড়ার পরিচর্যার অভাবে চামড়ার পচন ধরেছে। চামড়া ব্যবসার সাথে জড়িত একটি মহল মনে করেন ঢাকার পোস্তগোলা ও হাজারীবাগ, চট্টগ্রামের কালুঘাট, বগুড়ার ট্যানারী এলাকায় কি পরিমাণ চামড়া মজুদ হয়েছে, এছাড়া আর কোথাও কোন চামড়া মজুদ রয়েছে কিনা তা অনতিবিলম্বে তদন্ত করে দেখা উচিত। অন্যথায় তা পাচার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতি বছরই ঈদ মওসুমে এমনটি ঘটে থাকে। আমাদের সংগৃহীত চামড়ার দুই তৃতীয়াংশ চামড়া পাচার হয়ে ভারতে চলে যায়।

চামড়া ব্যবসায়ীদের মতে স্বার্থন্বেষী মহলের চক্রান্তে এ বছর (১৯৯৭ ইং) কোরবাণির সময় চামড়ার বাজারে দরপতন ঘটেছে। কোথাও দেখা গেছে বিশেষ মহলের মদদে চামড়া সন্ত্রাসীরা হুমকি দিয়ে নাম মাত্র মূল্যে চামড়া সংগ্রহ করেছে। আবার কোথাও ব্যাংক ঋণ দেয়নি এ দোহাই দিয়ে চামড়ার দর কমিয়ে রাখা হয়েছে। যে সব যুবক ন্যায্যমূল্যে চামড়া কিনেছে তারা চামড়া বিক্রি করতে গিয়ে চরম মার খেয়েছে। এতে তারা কম করে হলেও ৫০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চামড়া শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মতে, এবার অভ্যন্তরীণ বাজারে চামড়ার দরপতনের যৌক্তিক কোন কারণ ছিল না। কারণ বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের চামড়া এবং চামড়ার পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া দেশে নতুন নতুন চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বিশ্ব বাজারে চামড়ার বাজার দরও মোটামুটি ভাল। তাহলে অভ্যন্তরীণ বাজারে কোরবাণির পশুর চামড়ার দরপতন ঘটবে কেন? শেয়ার বাজারে দর উঠা-নামার সর্বনাশা খেলার ইন্দন যুগিয়েছে ঋণখেলাপিদের একটি অংশ। চামড়ার দর পতনের ক্ষেত্রে এদের একটি অংশের হাত রয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। কাজেই বিষয়টি তদন্ত হওয়া উচিত এবং ব্যাংকগুলো কাকে ঋণ দিয়েছে এর একটি পূর্ণ তালিকা প্রকাশ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের কারণেই শিল্পখাতে

www.pathagar.com

পুঁজি বিনিয়োগ পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এরাই বিভিন্ন সময়ে পুঁজি বাজারসহ অর্থ ও শিল্পাঙ্গনে অসুভ খেলায় মেতে উঠে। ফলে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অচলতার সৃষ্টি হয়। এদিকে বকেয়া পাওনা না পেয়ে পাইকাররা ট্যানারী মালিকদের কাছে চামড়া সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। অন্যদিকে তারা ফড়িয়াদের কাছ থেকেও চামড়া কেনার সমর্থ হারিয়েছে।

অভিজ্ঞজনদের মতে ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা না থাকার কারণেই চামড়া শিল্পে অচল অবস্থা দেখা দিয়েছে। এ জন্য দায়ী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এবং অর্থমন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী ও বাংলাদেশ গভর্ণর যাদের কাছেই ট্যানারী ব্যবসায়ীরা সরাসরি যোগাযোগ করেছেন তারা সবাই এক বাক্যে নিজেদের দায়িত্ব অন্যদের উপর চাপিয়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এ ধরনের হয়রানিমূলক আচরণের কারণে কোরবাণির চামড়া ক্রয় করার জন্য ব্যাংক ঋণ পাওয়া সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতি হিসেবে কাঁচা চামড়ার এক বৃহৎ অংশ যার আনুমানিক মূল ৬০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে বিভিন্ন সীমান্ত পথে পানির দরে ভারতে পাচার হয়ে যায়।

বর্তমান সরকারের মতিগতি দেখে মনে হয় বাংলাদেশের এই চামড়া শিল্পকে ভারতের হাতে তুলে দিতে পারলেই তাদের আরেকটি বিজয় সূচিত হবে। বাংলাদেশ চামড়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মার্কেটের পর্যায়ে যাতে পৌছাতে না পারে সেজন্য এটি একটি সুচতুর পরিকল্পনা কিনা তা জাতির সচেতন অংশকে ভাবিয়ে তুলেছে।

বাংলাদেশ ট্যানারী এসোসিয়েশনের মহাসচিব আব্দুল হাই সম্প্রতি বলেছে, বর্তমান সরকার চাচ্ছে চামড়া শিল্পেও যেন ভারত এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই সরকার বিগত ৯ মাসে ৯পয়সারও উপকার করেনি। বিশেষ করে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় দৈনিক-সমূহর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কাছে বার বার অনুনয় বিনিনয় করা সত্ত্বেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, এবার উত্তরবঙ্গ থেকে কোন চামড়া ঢাকায় আসেনি। নগদ টাকা না থাকার কারণে স্থানীয় চামড়া ব্যবসায়ীরা চামড়া কিনতে পারেনি। ঐ অঞ্চলের যাবতীয় চামড়া ফরিয়াদের মাধ্যামে ভারতে পাচার হয়ে গেছে।

সাধারণত ঈদে সারা বছরে সংগ্রহকৃত চামড়ায় প্রায় ৫০ শতাংশ সংগ্রহ করা হয় এবং চামড়ার গুণগত মানও অন্যান্য সময়ের চেয়ে এ সময় উন্নতর হয়ে থাকে। ঠিক এমনি একটি সময়কে বেছে নেয়া হয়েছে সংকট সৃষ্টির জন্য। নেপথ্যে ভারতীয় সেবাদাসরা যে সক্রিয় রয়েছে তা কাউকেই বলে বুঝাতে হবে না। দর পতনের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি অবস্থা শেয়ার বাজারে গত বছর (১৯৯৬ ইং আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর) তাদেরই ইন্দনে সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার জন্য নানা ধরনের কূট কৌশল অবস্থা বুঝে তৈরি করা হয়।

www.pathagar.com

২৩ এপ্রিল '৯৭ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা চামড়া শিল্প সম্পর্কে সরকারি বক্তব্য সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন। ট্যানারী শিল্পখাতে অনাদায়ী খেলাপি ঋণ এবং ঈদের আগে ২১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ প্রসঙ্গে ব্যাংক বিভাগের সচিব সৈয়দ আমরি উল মূলক সাংবাদিক সম্মেলনে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ ট্যানারী এসোসিয়েশন। এসোসিয়েশনের কাছে মূল ঘটনাকে ধামা-চাপা দিয়ে চামড়া শিল্পের সংকটকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য অর্থমন্ত্রণালয় হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত। চামড়াজাত সামগ্রী ট্যানার্স এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ এবং চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী রফতানিকারকগণ বর্তমানে চামড়া শিল্পের ধস, পাচার ও পচনের জন্য যারা এবং যাদের কর্মকাণ্ডকে দায়ী করা হয়েছে তাদের চিহ্নিত করার জন্য একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠনে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ আশু কামনা করেছেন।

বাংলাদেশ ট্যানার্স এসোসিয়েশনের মহাসচিব মুহাম্মদ আব্দুল হাই অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, গত ২৩ এপ্রিল '৯৭ ব্যাংকি বিভাগের সচিব সাংবাদিকের কাছে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অবাস্তব এবং নৈতিকতা বিরোধী। তিনি বলেছেন ট্যানারী শিল্পখাতে ১২'শ কোটি টাকা অনাদায়ী ৫৫৩ কোটি টাকা ঋণ খেলাপি এবং ঈদের পূর্বে ২১৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার তা হলো বিগত ২৫ বছরে অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এই শিল্পে ১২'শ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে। এই সব ঋণের অধিকাংশই পুনতফশীলকৃত ও নবায়নকৃত হওয়া সত্ত্বেও এ খাতে খেলাপিঋণের পরিমাণ ৫৫ কোটি টাকা একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব। ঈদের পূর্বে ২১৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে বলে যে প্রচার অর্থমন্ত্রণালয় করেছে তার সংগে দ্বিমত পোষণ করে তিনি দাবি করেন উক্ত টাকা ঈদুল আযাহার পূর্বে কোন কোন ট্যানারী প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছে তার একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট পত্রিকায় প্রকাশের অনুরোধ জানিয়েছেন। মূলত গত ২ এপ্রিল '৯৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের কোরবাণি ঋণের সাকুর্লারের আলোকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কোন রূপ বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই।

অধিকাংশ রফতানিকারকগণই কোরবাণির ঋণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, ফলে চামড়া শিল্পে আজকের এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

---

www.pathagar.com

ওষুধের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ঃ চোরাই পথে অবাধে ভারতীয় ওষুধ ঢুকছে

১৯৮২ সালের ৭ জুন ওষুধনীতি ঘোষিত হওয়ার পর আশা করা গিয়েছিল যে, এ দেশের সাধারণ মানুষ স্বল্প মূল্যে সঠিক মানের ওষুধ সেবনের সুযোগ পাবে এবং শিল্পকে কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীর মুনাফার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এ যুক্তিসংগত কারণেই এ দেশের সচেতন মানুষ ওষুধনীতিকে সমর্থন জানিয়েছিল, যা আন্তর্জাতিকভাবেও যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বলতে হয় ওষুধনীতি ঘোষিত হওয়ার প্রথমদিকে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পর্যায়ক্রমে তা আবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

ওষুধে অমানবিক অনিয়ম ঃ ওষুধ একটি জীবন রক্ষাকারী পণ্য (Life Saving Drug) বিধায় গোটা জাতির স্বাস্থ্য এর উপর নির্ভরশীল। ওষুধে যদি কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, স্বাভাবিকভাবে তখন বিচলিত না হয়ে পারা যায় না। কেন ওষুধে আজ গুণগত মান বজায় না থাকার অভিযোগ উঠছে। কেন ওষুধে আজ এতো অনিয়ম পরিলক্ষিত হচ্ছে তার পর্যালোচনা ও প্রতিকার হওয়া দরকার। কারণ জনগণও আজ জীবন রক্ষাকারী পণ্য নিয়ে এহেন মারাত্মক অমানবিক অনিয়মের একটি বিহিত ব্যবস্থা কামনা করে।

যাই হোক, ইদানীং পত্রিকার পাতা উল্টালেই নজরে পড়ে ওষুধের গুণগত মান বজায় থাকছে না, ওষুধে ভেজাল, নকল ওষুধের কারখানা আবিষ্কার ইত্যাদি বিষয়ের ওপর প্রামাণ্য সংবাদ।

কিছুদিন আগে সবক'টি জাতীয় দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ প্রকাশ পায়। সংবাদটি ছিল এরকম–ওষুধে ভেজাল দেয়ার কারণে ৪ জন ওষুধ কোম্পানির কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ওষুধে ভেজাল এবং নিম্নমানের ওষুধে বাজার ছেয়ে যাওয়ার উপর দীর্ঘ প্রতিবেদন সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছিল। প্যারাসিটামল সিরাপ সেবনে শত শত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সংবাদও আমরা পত্রিকায় দেখেছি। অত্যন্ত দুঃখজনক কোন একটি ওষুধ কোম্পানি শিশুদের জ্বর ও ব্যথা উপশমের এই ওষুধটি কীটনাশক ওষুধ তৈরির কাঁচামাল দিয়ে প্রস্তুত করেছেন বলে শোনা যায়।

www.pathagar.com

ওষুধ প্রশাসনের মান নিয়ন্ত্রণ কমিটির দেয়া হিসেব মতে, দেশে নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০০ টি। এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছিল স্থানীয় একটি জাতীয় দৈনিকে। দেশে মোট ৪০০ টি ওষুধ শিল্পের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতো ওষুধ কোম্পানি আজ নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করার দুঃসাহস করছে। এছাড়াও অভিযোগ এসেছে যে, বাজারে বহু ওষুধের গায়ে ব্যাচ নম্বর, মূল্য এবং উৎপাদনের তারিখ লেখা থাকে না। যার কারণে বহু মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ অতিরিক্ত মূল্যে প্রতিদিন বাজারে বিক্রি হচ্ছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে, এ সমস্ত ওষুধ ব্যাধি নিরাময় নয় বরং রোগ-ব্যাধি বাড়িয়ে দেয় এবং অনেক সময় তা স্বাস্থের জন্য হুমকি হয়ে দেখা দেয়।

বাজারে এ পর্যন্ত নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ, নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদেশী ওষুধ ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান এবং অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট ব্যতিরেকেই ওষুধ বিক্রি, ওষুধ প্রশাসনের দুর্নীতির কাহিনীসম্বলিত ঘটনা, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদারকীর ক্ষেত্রে নির্বিকার ভূমিকা এবং এরই সুযোগে কতিপয় অসাধু ওষুধ প্রস্তুতকারক মোটা অংকের ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে নিম্নমানের ওষুধ বাজারজাত করার চাঞ্চল্যকর সংবাদ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসহ পত্রিকায় বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। বিটিভি কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও এর উপর ধারাবাহিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। দেশের অভিজ্ঞ মহল ওষুধের মান হঠাৎ কমে যাওয়ার আরও সুনির্দিষ্ট কিছু কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী এম শামসুল হক কর্তৃক একটি সাপ্তাহিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ওষুধের মান রক্ষায় উৎপাদকের যন্ত্রপাতি, নিরপেক্ষ প্রশাসন, নিরপেক্ষ ল্যবরেটরী স্থাপন, দক্ষ জনশক্তি ও পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি আমাদের নজর রাখা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা পারিনি বলেই আমরা মানসম্মত ওষুধ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। উক্ত সাক্ষাৎকারে ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রসঙ্গে বেক্সিমকোর চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান বলেছেন, ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরী থাকা আবশ্যক। ল্যাবরেটরীর নিজস্ব লোকেরা ওষুধ বাজারজাত হওয়ার সাথে সাথে তা বাজার থেকে সংগ্রহ করে মান যাচাই করলে সে ক্ষেত্রে ওষুধের মানের আরও উন্নতি সাধিত হতো এবং ইচ্ছা করে ওষুধ কোম্পানিগুলোর মুনাফা লোটার যে প্রবণতা তা অনেকটা কমে যেতো।

অনেক অভিজ্ঞজনের মতে বাজারে ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখার যে প্রতিযোগিতা অতীতে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম তা এখন নেই বললেই চলে। কারণ বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এ দেশ থেকে তাদের ব্যবসা ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে ফেলছেন। বহুজাতিক কোম্পানির স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধ এবং লোকাল কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা ছিল তা এখন আর থাকছে না : ৯ টি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির মধ্যে ৪/৫ টি কোম্পানি ইতিমধ্যেই তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে।

www.pathagar.com

ফাইজার রূপান্তরিত হয়েছে রেনাটায় এবং আই সি আই রূপান্তরিত হয়েছে এ সি আইতে। দুইটি কোম্পানির মালিকানা এখন বাংলাদেশীরা নিয়ন্ত্রণ করছেন। এতে শুধু ওষুধের গুণগতমান রক্ষার প্রতিযোগিতাই বিনষ্ট হচ্ছে না পাশাপাশি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগেও স্থবিরতা দেখা দিবে বলে অভিজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গ নিয়ে যে কথাটি বলছিলাম, আজ দেশে অবস্থিত ৪০০ টি ওষুধ কোম্পানির মধ্যে ৩০০ টি ওষুধ কোম্পানির আধুনিক মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ নেই। ওষুধের গুণগত মান বজায় না থাকার এও একটি বড় কারণ ছিল বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

ওষুধনীতি প্রণয়নের মূল কারণ ঃ জাতীয় অধ্যাপক ডঃ নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে জাতীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ বাস্তবায়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল, (১) অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকর সকল ওষুধ ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা, (২) দেশে পর্যাপ্ত ওষুধ উৎপাদন করে বিদেশি ওষুধের আমদানি হ্রাস করা, (৩) ওষুধের গুণগতমান বজায় রেখে স্বল্প মূল্যে ওষুধ সরবরাহ করা। এক কথায় একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গড়ে তোলার পাশাপাশি ওষুধ ব্যবসার সকল অনিয়ম রোধ করাই ছিল ওষুধনীতির মূল কাঠামোগত বিষয়। অপ্রিয় হলেও সত্য, দেশে উল্লেখিত তিনটি নীতির একটিও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। এটা জাতির জন্য ছিল সবচেয়ে দুঃখজনক একটি অধ্যায়। কারণ ওষুধের সাথে রয়েছে মানুষের বাঁচার সম্পর্ক। অত্যন্ত দুঃখজনক যে দেশে নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও কেন সে আইন আজ তার নিজস্ব গতিতে চলতে পারছে না। কিভাবে এরা উৎপাদন লাইসেন্স পায় এবং কেন আজ সে লাইসেন্স বাতিল হয় না। ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের তাহলে কাজটি কি এ প্রশ্ন আজ সচেতন গোটা দেশবাসীর।

মুনাফালোভী কতিপয় ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কারণে গোটা জাতির স্বাস্থ্য আজ হুমকিস্বরূপ। এর একটা বিহিত ব্যবস্থা জাতি একান্তভাবে আজ কামনা করছে। ওষুধের গুণগতমান বজায় রাখার লক্ষ্যে ওষুধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল অনিয়ম রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত হবে নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনায় আনা।

কখন ওষুধ অনুমোদন দেয়া যেতে পারে

একক বা সংযুক্ত উপাদানে তৈরী ওষুধকে শুধুমাত্র তখনি অনুমোদন দেয়া যেতে পারে যখন কোন ঔষধ প্রতিষ্ঠান সেই ওষুধের সুনির্দিষ্ট বর্ধিত গুণাগুণ এবং সুনিশ্চিত ফল দেবার বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এবং প্রমাণাদি হাজির করবে। সেসব বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রকাশনা, ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফর্মূলারী, ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়া, ইউ, এস ফার্মাকোপিয়া কিংবা অন্যান্য স্বীকৃত প্রমাণিক সূত্র যেমন—গুডম্যান গিলম্যানের "দি

www.pathagar.com

ফার্মাকোলজিক্যাল ব্যাসিক অব থেরাপিউটিকস" এবং "কারেন্ট মেডিক্যাল ডায়াগনসিস" ইত্যাদির ভিত্তিতে হতে হবে। তাদের এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, উপাদানগুলোর সংমিশ্রণ ওষুধের বর্ধিত বিষক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে কোন রূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে না।

আমাদের মত গরিব দেশে প্রয়োজনীয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধের ভীষণ অভাব। যেসব ওষুধের প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি, সেগুলো ততবেশি দুর্লভ, বাজারে পাওয়া গেলেও কেনার সামর্থ্য অনেকেরই নেই। অথচ অপ্রয়োজনীয় নিম্নমানের ওষুধ নামে মাত্র ভিটামিন আর টনিক বাজারে বিক্রির ছাড়পত্র পাচ্ছে দেদার। এগুলো আজ সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের ভেবে দেখা প্রয়োজন।

ওষুধ নিম্নমান হওয়ার কতিপয় কারণ

(১) কর্তৃপক্ষের দেয়া ওষুধের কঠোর মূল্য নির্ধারণ নীতি সঠিক মূল্যের সঠিক মানের ওষুধ প্রস্তুত বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা।

(২) ওষুধ ব্যবহারের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেলে (Date Expired) সে ওষুধের কোন কার্যকরী ভূমিকা থাকে না।

(৩) উন্নত মানের মোড়ক এবং তৎসংক্রান্ত প্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ওষুধ নষ্ট হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

(৪) নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার, কাঁচামাল জীবণুমুক্ত পরিবেশে না রেখে ওষুধ তৈরি এবং কাঁচামাল ওষুধ তৈরির উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকেই ওষুধ প্রস্তুত করলে ওষুধ নিম্নমানের হতে পারে।

(৫) ভয়াবহ বন্যা, সীমাহীন খরায় যথোপযুক্ত নিয়মে ওষুধ সংরক্ষণ না করলে ওষুধ নিম্নমানের হতে পারে।

(৬) ভুল মাননিয়ন্ত্রণ এবং ভুল প্রস্তুতিও ওষুধের নিম্নমান হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

(৭) অধিক মুনাফা লাভের আশায় ইচ্ছাকৃতভাবে অসাধু ব্যবসায়ীরা ওষুধের গুণগত মান বজায় না রেখে "উপরির" মাধ্যমে ছাড়পত্র নিয়ে ওষুধ বাজারজাত করার কথা ইদানীং বেশি শোনা যায়। এ সমস্ত ব্যাপারে স্ব-স্ব অবস্থানে সবাই নিজ নিজ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে কিনা তা তদারক করে দেখার দায়িত্ব একমাত্র ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের।

www.pathagar.com

প্রস্তাবাবলি

(১) দেশে প্রতিষ্ঠিত সকল ওষুধ কোম্পানিতে মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার রয়েছে কিনা, অভিজ্ঞ ভেষজ ও রসায়নবিদদের দ্বারা ওষুধ উৎপাদন, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণনে কঠোর নিয়মনীতি যা W.H.O. (World Health Organisation) অনুমোদিত গুড ম্যানুপেকচারিং প্রাকটিস (জি এম পি) বাস্তব অনুশীলন হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও আকস্মিক তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের।

(২) সরকারি বিশ্লেষক কর্তৃক নিম্নমানের ওষুধ যাতে সঠিক মানের ছাড়পত্র না পায় এবং সঠিক মানের ওষুধ নিম্নমানের বলে অযথা যাতে হয়রানির শিকার হতে না হয় তাও নিশ্চিত করতে হবে।

(৩) নকল, ভেজাল ও বেআইনী ওষুধ প্রস্তুত ও আমদানির ক্ষেত্রে তথা সর্বোপরি ঘৃণ্যতম কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে হবে অথবা সমপর্যায় শাস্তির বিধান জারি করতে হবে।

(৪) ওষুধ তৈরির কাঁচামাল উন্নতমানের হতে হবে। নিম্নমানের কাঁচামাল ব্যবহার, কাঁচামাল জীবাণুমুক্ত পরিবেশে না রেখে ওষুধ তৈরি এবং কাঁচামাল ওষুধ তৈরির উপযোগী কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রযুক্তিগত আধুনিক ব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ নিম্নমানের হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এই জন্য প্রতিটি ওষুধ কোম্পানিতে টেস্টিং ল্যাবরেটরী থাকতে হবে এবং তা তদারক করে দেখার দায়িত্ব একমাত্র ওষুধ প্রশাসন কর্তৃপক্ষের।

(৫) ভুল মান নিয়ন্ত্রণ এবং ভুল প্রস্তুতিও ওষুধের নিম্নমান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য অভিজ্ঞ ভেষজ ও কেমিস্ট দ্বারা উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

(৬) উন্নতমানের মোড়ক এবং তৎসংক্রান্ত প্যাকিং ব্যবস্থা উন্নত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় ওষুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর রাখতে হবে।

(৭) ৪০০ টি ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রায় ৯০০০ প্রডাক্টস (যার বাৎসরিক বিক্রি মূল্য প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা) বাজারজাত করার সাথে সাথে প্রতিনিয়ত যাতে পরীক্ষা চালানো যায় সেজন্য বিভাগীয় পর্যায়ে সরকারি মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করতে হবে এবং ওষুধের নমুনা সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। ওষুধ প্রশাসনে এ ব্যবস্থা এখনো ব্যাপকভাবে গড়ে উঠেনি বলে শোনা যায়।

(৮) সর্বোপরি ওষুধের মান পরীক্ষার লক্ষ্যে নমুনা সংগ্রহের সময় ওষুধটি কোন অবস্থায় ছিল তার পারিপার্শ্বিকতার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য স্ব-স্ব কোম্পানির বিশ্বস্ত

www.pathagar.com

প্রতিনিধির উপস্থিতিতে করলে তা ভাল হয়। কারণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না।

(৯) পাস করা ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র এবং দোকানে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট নিয়োগ ব্যতিরেকেই কোন ওষুধ বিক্রি করলে এবং ড্রাগ লাইসেন্সবিহীন ওষুধের দোকান থাকলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান প্রয়োগ করতে হবে।

(১০) সঠিক মান নির্ণয়ের জন্য ওষুধ প্রশাসনের মান নিয়ন্ত্রণ কমিটিতে অভিজ্ঞ পাস করা ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্ট নিয়োগ করতে হবে।

(১১) ভয়াবহ বন্যা, সীমাহীন খরায় যথোপযুক্ত নিয়মে ওষুধ সংরক্ষণ না করলে ওষুধ নিম্নমানের হতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।

(১২) মেয়াদোত্তীর্ণ (Date Expired) কোন ওধুধ বাজারে বিক্রি হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১৩) ওষুধ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন জটিলতা দূরীকরণ। ওষুধ বিজ্ঞানে আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার এবং রিসার্চ প্রডাক্ট তৈরি যা দেশে বিদ্যমান দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে সহায়ক হবে তা নিয়ে প্রতিবছর, সকল ওষুধ কোম্পানির কর্মকর্তা এবং ওষুধ বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে একটি সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করতে হবে এবং প্রতিটি ওষুধ কোম্পানি তাদের ওষুধের গুণাগুণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন বার্ষিক রিপোর্ট আকারে উক্ত অনুষ্ঠানে পেশ করলে ভাল হয়। উল্লেখিত ব্যবস্থাটি একমাত্র সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে বলে আমি মনে করি।

উল্লেখিত নিয়মগুলো বাস্তবায়িত করতে হলে ওষুধের অঙ্গনে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে হবে। আইন যদি তার নিজস্ব গতিতে চলে তাহলে ওষুধে অনিয়ম বন্ধ হতে বাধ্য।

মূল কথা

শিক্ষা আর স্বাস্থ্য একটি জাতির মেরুদণ্ড। একটি জাতির চরিত্র এবং স্বাস্থ্য যদি ঠিক না থাকে তাহলে সে জাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। অপ্রিয় শোনালেও সত্য, আজ এই শিক্ষা আর স্বাস্থ্য নিয়ে চলছে এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত। নোংরা রাজনীতির নামে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, অডিও-ভিডিও এবং মাদকদ্রব্য দ্বারা জাতীয় চরিত্রকে সুপরিকল্পিতভাবে বিনাশ করার প্রচেষ্টা চলছে। ঠিক তদ্রূপ চিকিৎসা ও ওষুধে অমানবিক অনিয়ম সৃষ্টি করে জাতীয় চরিত্রকে সুকৌশলে ধ্বংস করে দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। যার পিছনে বিদেশী শক্তির সক্রিয় ভূমিকা থাকাও অস্বাভাবিক নয়। আজ এ সমস্ত খবর জাতীয় দৈনিকসমূহের হেড লাইন হয়ে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

ইদানীং শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় শিল্প পণ্য অনায়াসে আনার ব্যাপারে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো তৎপর রয়েছে। হিন্দুস্থান মটরস-এর কাছে তুলে দেয়া হলো প্রগতির মতো একমাত্র বৃহৎ মোটর ও বাস কারখানাটির ভাগ্য। ইতিপূর্বে শত সমালোচনার মুখেও ভারত থেকে অধিক মূল্যে নিম্নমানের বি. আর. টি. সি বাস আনা হলো। এভাবে আজ অধিক মূল্যে ভারতীয় নিম্নমানের কাঁচাবাজারের পণ্যসামগ্রী থেকে আরম্ভ করে বিলাস সামগ্রী নিত্যব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী এবং ভারী শিল্পের যন্ত্রপাতি যেমন অশোক, টাটা, বিড়লা, বাজাজ এবং হিন্দুস্থান মোটরসের যন্ত্রপাতিতে বাজার ভরে গেছে। এর থেকে ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র ওষুধ শিল্প। কিন্তু তাও এখন ভারতের দখলে। ওষুধের পাইকারী বাজার মিটফোর্ড ও বাবুবাজার এখন ভারতীয় ওষুধে ছেয়ে গেছে। সীমান্ত এলাকার শহরের মানুষ আজ পাসপোর্ট ও ভ্রমণ কর ছাড়া শুধুমাত্র ১০০ টাকার বিনিময়ে বর্ডার অতিক্রম করে চিকিৎসাসহ অন্যান্য কাজকর্ম সেরে আসছে। বৈধ ও অবৈধভাবে প্রচুর মানুষ ভারতে প্রতিদিন যাচ্ছে। চিকিৎসার কাজে যাচ্ছে এমন মানুষের সংখ্যাও প্রচুর। ভারতীয় ডাক্তারদের পেসক্রাইব করা ওষুধ এখন রাজধানীর মিটফোর্ড মার্কেটে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় নগরীর অভিজাত এলাকার ফার্মেসীর দোকানসমূহে। ডাইবেটিস রোগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ইনসুলিন ইনজেকশন এখন ভারত থেকে আসছে। মিটফোর্ডের ওষুধের বাজার এখন ভারতের দখলে। কাগজে উঠেছে–দেশের তিন হাজার কোটি টাকার ওষুধের বাজারে ১২ শ কোটি টাকার ওষুধ আসছে চোরাই পথে ভারত থেকে।

মুক্ত বাজার অর্থনীতি যে যথেচ্ছাচারের লাইসেন্স নহে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে মুক্ত বাজারের নামে অবাধ বাণিজ্য আগ্রাসনের ফলে বাংলাদেশের ওষুধ থেকে শুরু করে কোন পণ্যই স্থানীয় বাজারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তদস্থলে থাকবে ভারতীয় ও বহুজাতিক কোম্পানির প্রস্তুতকৃত পণ্যসামগ্রী। দেশীয় শিল্পের স্বার্থে এখনই সময়পোযোগী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এহেন পরিস্থিতিতে গোটা জাতির সুস্বাস্থ্য এবং একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হলে ওষুধ প্রস্তুতে সকল ধরনের অনিয়ম বন্ধ করার পাশাপাশি দেশের শিল্প উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয় এবং শিল্পক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপ যাতে এসে না পড়ে, সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একটি কার্যকরী শক্তিশালী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com

হারুন-আর-রশিদ একজন জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক, গবেষক, কলাম লেখক এবং বহু গ্রন্থের প্রণেতা। এ পর্যন্ত তার ৮ টি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছে। হিসাব বিজ্ঞানে সম্মান সহ স্নাতকোত্তর। পেশাগত বিষয় ছাড়াও কষ্ট একাউন্টিং, কম্পিউটার সাইন্স ও অর্থনীতির উপর তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি লিখছেন জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে। চলমান রাজনীতি ও সমাজ সচেতন একজন ব্যক্তি হিসেবে ষাটের দশক থেকে তিনি এ অঞ্চলের সমাজ পরিবর্তন, রাজনীতি ও অর্থনীতির উত্থান-পতন স্বচোক্ষে অবলোকন করেছেন। এক সময়ে তা লেখনীর মাধ্যমে কাগজে প্রকাশও করেছেন। আজও তার সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তুলনামূলক রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসের ঘটনাবলী, সংস্কৃতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি এবং জাতীয় ব্যক্তিত্বদের উপর এ পর্যন্ত তার তিন শতাধিকের উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী ফিচার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত সংস্কারধর্মী কবিতা, ছোটগল্প "এক মোহনা" এবং "অন্যরকম" নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাসও পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে।

তিনি শুধু একজন লেখক নয়, একজন কবি, সুসাহিত্যিক, সমালোচক, সুবক্তা এবং পাঠকও বটে। বিভিন্ন গ্রন্থের উপর তার একাধিক পর্যালোচনা/সমালোচনা দৈনিক ইত্তেফাকসহ বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত হয়েছে। অগণিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে মূল প্রবন্ধ পাঠসহ জোরালো বক্তব্য রেখেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়রোধে এবং পরিচ্ছন্ন অর্থনীতির বিকাশ সাধনে নিরলস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।